রসময় যার নাম

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্রীবাণী বুক হাউস
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
রেবা ব্যানার্জ্জী,
নিমতা—চৌধুরী পাড়া,
২৪ পরগণা।

মুদ্রাকর :
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
৪২এ, মলঙ্গা লেন, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রী চণ্ডী লাহিড়ি

নতুন সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬৫

প্রাপ্তিস্থান :
নালন্দা গ্রন্থাগার
৪১।৫, রসা রোড সাউথ
কলিকাতা—৩৩

দাম
একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

শ্রীমান অভীকে মোর
স্নেহের আশীর্ব্বাদ,
লভুক জীবন ভোর
প্রচুর হাসির স্বাদ ॥

শিব্রাম কাকা

এই বইয়ের গল্প

রসময় যার নাম !

মেঘেন, তোমায় বারণ করি। রসময় যদি তোমাকে নেমতন্ন করে, কদাপি যেয়ো না। তার দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাবার জন্যে বন্ধুদের সবাইকেই ও সাধছে। কিন্তু তোমাকে আমি আগে-ভাগেই সাবধান করে দি, ভুলেও যেন কোনো ছুটি-ছাটার সুযোগে ওর বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ো না।

যদি যাও, তাহলে তোমারো ঠিক আমার দশাই হবে। যারা যারা গেছে, সবারই সেই এক হাল হয়েছে। রসময় আজকাল, কেন যে তা বলতে পারি না, নিজের নামের মর্য্যদা রাখতে উদ্যত।

নিজেকে সে অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ করতে চায়। র স ম য়— অক্ষরগুলির উপর লক্ষ্য রাখো, তাহলে এই এক কথাতেই আমার কথার আন্দাজ পাবে। আঁচ পাবে ব্যাপারের। এতেও যদি না বোঝ তাহলে জব্দ হয়ে বুঝবে। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পাবে। এর বেশি বুঝতে হলে ওর রসের ছোঁয়াচ পেতে হবে তোমায়। যেতে হবে ওর বাড়ি। আর সেখানে গিয়েছো কি গ্যাছো ! সে দুর্গতি থেকে—মা দুর্গা তোমাকে রক্ষে করুন।

গত শনিবার আমি গেছলাম—রসময়ের বাড়ি—তার আমন্ত্রণ রাখতে।

হাওড়া-আমতা লাইন। আমতা আমতা করে গাড়ি তো পৌঁছুল কোনোগতিকে। ইষ্টিশন থেকে খুব বেশী দূরে নয় ওর আস্তানা। সোজা রাস্তা ধরে সন্ধ্যের আগেই গিয়ে উঠেছি।

গেট দিয়ে ঢুকেই বাগানের মত খানিকটা। এগুচ্ছি তো এগুচ্ছি,

কোথাও কারো টিকির দেখা নেই। চ্যাঁ চ্যাঁ আওয়াজ শুনে চমকে গেলাম হঠাৎ। গাছের ডালে এক প্যাঁচা বসে। খাঁচার মধ্যে ঝুলছে। পাঁচাকে যে মানুষ আদর করে খাঁচায় রাখে, রেখে পোষে, আমার জানা ছিল না। কোনোদিনও শুনিনি যদ্দুর জানি, প্যাঁচা, বাদুর, আর্সোলা, টিকটিকি চামচিকে প্রভৃতি জীবজন্তুরা ঘরে এসে আড্ডা গাড়লেও গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে নয়।

যাই হোক, ঘরোয়া প্যাঁচা মনে করে ভাবলুম একটু ভাব করি। একটু আদর করা যাক। খুব সাবধানে, ওর গায়ে নয়, খাঁচার গায়ে হাত বোলালুম। ছুঁতে না ছুঁতেই ব্যাটা এমন চ্যাঁচাতে সুরু করলো, কী বলবো।—কোঁকর কোঁ—কোঁকর কোঁ—কোঁ—কোঁ।

কোঁকা ধ্বনি শুনে ধোঁকা লাগলো—মুর্গি নাকি? প্যাঁচার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না—মা-লক্ষীর ছবির বাইরে চর্মচক্ষে কখনো দেখিনি - কিন্তু মুর্গিরা তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ—প্রতিদিনকার দ্রষ্টব্য—আর তাদের হাব-ভাবও আমার কিছু অচেনা নয়। মুর্গিকে প্যাঁচা বলে ভ্রম করবো এ কি সম্ভব? এই রকম সন্দেহদোলায় দুলছি, এমন সময় রসময় এসে আমার চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করল।

হাসতে হাসতেই এগিয়ে এলো সে—"এই যে মুর্তিমান! এসে গ্যাছো! প্যাঁচার চ্যাঁচানিতেই টের পেয়েছি যে তুমি এসেছো। হাঁ করে দেখছো কি? ওটা প্যাঁচা নয়, পাখীই না, ফাঁকি। সেলুলয়েডের বানানো—রেকর্ডে বাজানো এক চীজ্।"

—"বুঝেছি। পক্ষা-আকারে ফক্কিকার!" আমি দম নিয়ে বলি।—"প্যাঁচার ছদ্মবেশে এক প্যাঁচ?"

রসময় হাত বাড়িয়ে দিলো—হাসতে হাসতে। আবেগভরে ওর করমর্দন করলুম। কিন্তু নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়েছি কি, অমুনি তার হাতখানা ওর কনুয়ের থেকে খুলে এলো। কোনো কথা না বলেই। এসে গেল আমার হাতে!

আমার পিলে চমকে গেছে, বলতে কি! একেই আমার হার্ট

উইক্—মাঝে ভারী হার্ট ট্রাবল গেছে, তার ওপর—তার ওপরে ভয়ঙ্কর আরেক চোট গেল এখন। কক্ষচ্যুত ওর হাতখানা হাতে ধরেই আরেক হাতে নিজের নাড়ি টিপে পাল্স্‌রেট্ নিলাম—ধাক্কা সামলাতে সময় লাগলো আমার।

এদিকে রসময়ের আসল হাত অলেষ্টারের ভেতর থেকে বেরিয়েছে ততক্ষণে, ওর—অট্টহাস্যের সাথে। সে-হাত আমি ছুঁলাম না, আমার হস্তগতখানা ওর অলেষ্টারের পকেটে গুঁজে দিলাম।

"ছদ্মহাত, বুঝলে বৎস!" রসময় বললে। "ঠকে গেলে আবার।"

রসময়ের ছেলেও এগিয়ে এসেছিলো হাত বাড়িয়ে। আবার বোকা হবার ভয়ে আমি আগে সেটা বাজিয়ে দেখলাম। কি জানি, ওর ছেলে যদি ওর মতই প্যাঁচোয়া হয়? কথায় বলে বাপ্‌কা বেটা! তাই হাতে হাতেই বাজিয়ে নিলাম। টোকা মারলাম, চিমটি কাটলাম—তার পরে মুচ্‌ড়ে দেখব কি না ভাবছি কিন্তু আমার রাম চিম্‌টিতেই তাকে উঃ করে উঠতে দেখে—তখন—তবেই—তখনো বলতে কি বেশ ভয়ে ভয়েই তাকে আমি হাতিয়েছি।

ভয় মিথ্যে নয়! হাতটা খাঁটি হলেও ছেলেটার হাতের তেলোয়—অথবা তলায়—একটা নকল তেলো ছিল, রবারের তৈরী। টিপতেই তার ভেতর থেকে জলের তোড় ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আমার সার্টের তলা দিয়ে বগলের গোলে গিয়ে লাগলো।

আবার চন্‌কালাম। আবার এক গোল! আবার আমারি হার। তার উপরে শীতের দিনে সার্ট ভিজে গিয়ে দমেও গেলাম বেশ। "তোমার নাম কি খো—?" ওর হাতে পড়ার আগে যে-প্রশ্ন সুরু করেছিলাম, তা আর সম্পূর্ণ করা হোলো না।

ছেলেটি বললো—আমার নাম খোকা। হাসতে হাসতেই বলল।

"বছর বারোয় পড়েছে বটে, কিন্তু—"রসময় জানালে

"এখনো কোনো পাকা নাম রাখা হয়নি। এতদিন মামার বাড়ি ছিলো কিনা। নামকরণ তো সোজা কাজ নয়! আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে হবে। তুমি তো লেখক মানুষ, দাও না একটা ভালো নাম?"

"রসময়! রসময়ের ছেলে—অসময়। অসময় হলে কেমন হয়?" আমি শুধোই।

"ছেলেমেয়ের আবার সময় অসময় আছে না কি?" নামটা ওর মনঃপুত হয় না।

আমার নিজের মতে বিষময় রাখলেই বেশ হোতো। কিন্তু পাছে ওর রসালো মনে ঘা লাগে, আর খোকা আরো বেশি বিষাক্ত হয়ে ওঠে সেই ভয়ে মুখ ফোটাতে সাহস পাই না।

"চলো, চা খাবে চলো। কলকাতা থেকে আসচো—ক্লান্ত হয়েছো খুব।" রসময় বল্লে।

ভেতরে গিয়ে জমলাম। খোকা এক ট্রে চা নিয়ে এলো—কী তার খুশবু। আর কী বা রঙ! চায়ের তেষ্টা চানকে উঠলো চাইতে না চাইতেই।

"ঐ কুশন চেয়ারাটা টেনে নিয়ে বোসো আরাম করে।" রসময় বললে।

বসতে না বসতেই যেন জগঝম্প বেজে উঠলো হঠাৎ। আমিও লাফিয়ে উঠলাম। য়্যা! এ কোথায় বসেছি? পদ্মাসন মনে করে কোনো ছদ্মাসনের ওপরেই নাকি? ছদ্মবেশী কোনো পিয়োনোর ল্যাজে পা দিলাম না তো ভুল করে? নাঃ, এ রকম কুশনের চেয়ে কুশাসনে বসাও ঢের সুখের।

"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে—এ হচ্ছে তাই! বুঝলে হে গবেট!" রসময় হাসতে থাকে। "কেবল আসনের জায়গায় কুশন বসিয়ে নাও।"

আমি ওর কথায় কান দিই না। খোকা চায়ের কাপ্ টিপয়ের

ওপর রেখেছিলো—সেই দিকেই মন দিলাম। টিপয়ই সেটা, টিপিয়োনো নয়—টিপে দেখেছিলাম আগেই।

পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে দেখি সসারও আমার সম্মুখে এসেছে। চায়ের কাপের সাথে সাথে সেও হাজির—আঠা লাগানো না কি, অ্যাঁ—? তাই তো বটে, আঠা দিয়ে আঁটাই বটে—দেখা গেল।

যাক্ গে, আঁটা আছে তলায় আছে, ভিতরে তো আঠা নেই—তপ্ত তরল চা-ই তো বটে? এত দিনের পরিচয়ে চা চিনব না এমন নয়। চাখলাম একটু। চা ই বটে। কিন্তু একটু চিনির দরকার।

কৌটোর থেকে পেয়ালায় একটু চিনি ঢেলে নিয়েছি। ও মা, এ কি। চিনি ভাসতে লাগলো চায়ের ওপর। আমার ধারণা ছিলো চিনি অনেকটা আমার মতই,—আমারই সগোত্র। মিষ্টতার দিক দিয়ে যে তা বলছি না, সাঁতার না জানায় ব্যাপারেই। চিনি আর আমি—জলে পড়লেই তলিয়ে যাই। ডুবে যাই টুপ করে—আর ডুবে গিয়ে মারা পড়ি।

মিষ্টতায় ইতরবিশেষ থাকলেও আমরা দুজনেই মজ্জমান, ভাসমান নই। কিন্তু চিনিকে ভাসতে দেখে আমার আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে এল। সাবেক ধারণা টলে গেল আমার। নিজেকে সঠিক চিনি বলে মনে করতে পারলাম না। জলে ঝাঁপিয়ে পরীক্ষা করে দেখার উপায় ছিল কিন্তু চায়ের কাপ ডুব দেবার পক্ষে খুব বেশি কি? অগত্যা, ফুঁ দিয়ে চিনিদের ডুবিয়ে দিতে লাগলাম।

কিন্তু এক ফুৎকারে ডুবে যাবার জিনিষ নয় ও। চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেও লাভ হোলো না কোনো! যতই তাড়া দিই ততই ওরা ঘুরে ফিরে বেড়াতে থাকে এধার থেকে—ওধারে। সপ্রশ্ন চোখে রসময়ের দিকে চাইতেই সে সহাস্য মুখে একটা চামচ এগিয়ে দিল।

"চামচ নাও, চামচ দিয়ে ঠেঙাও।" বল্ল ও।

চামচের সাহায্যে চিনির সৎকার করা যায় কি না দেখি। না, অসম্ভব। পুকুরের পানার মত এরা ভাসতেই জন্মেছে, ডুবতে জানে না। একেই চিনির পানা বলে কিনা কে জানে!

চামচ দিয়ে বেয়াদব চিনিদের তুলে ফেলতে যাই—গিয়ে দেখি—আবার রসময়ের হাস্যোদ্রেক্ করেছি।—চায়ে ডোবাতেই চামচ গলতে সুরু করলো। দেখতে দেখতে গোটা চামচটাই গলে চা হয়ে গেল। কাপের সঙ্গে গলাগলি হয়ে একনিষ্ঠ সেই সসারের উপরে উপচে পড়ার মতন হোলো।

বাপ-ব্যাটাও হাসিতে উপচে পড়লেন। চিনির চলৎ-শক্তিতে আমি অবাক হইনি, বাজার থেকেও মাঝে মাঝে ওকে উধাও হতে দেখেছি তো। কিন্তু চামচের গলৎ—শক্তিতে চমৎকৃত হলাম। যাই হোক, ওদের উচ্ছ্বসিত হাসির সামনে নিজের বিস্ময়দমন করে পাপ বিদেয় করলাম—চিনি, চামচ চা—সব। এক চুমুকে চালান দিলাম পেটের গর্তে।

বিষময় বললে, আসুন কাকাবাবু, লুডো খেলা যাক্ একটু।

খেলার কথায় উৎসাহ জাগে আমার। কিন্তু লুডোর ছক্টা কুলুঙ্গির তাক থেকে পাড়তে যেতেই তার ফাঁক থেকে এইসা এক কাঁকড়া বিছে তড়াক করে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে চম্‌কে উঠে দেখি—যাক্, তবু রক্ষে। সত্যিকার বিছে না। সেলুলয়েডের বানানো।

রসময় একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিলো। আমি বললাম—সিগ্রেট তো আমি খাই না বন্ধু।

"টানো না, আরাম পাবে টানলে। ভয় নেই, খাঁটি সিগ্রেট সেলুলয়েডের নয়।" বললো রসময়।

নিলাম, ধরালাম, টান্‌ছি—প্রথম যাদের হাতে খড়ি ঠিক তাদের মতই—প্রাণপণে। হঠাৎ দুম্! সিগ্রেট বলা নেই কওয়া নেই পট্‌কার মত ফেটেছে—আমার মুখের ওপরেই। আমাকেই পট্‌কাবার মৎলবেই বোধহয়!

সারা সন্ধ্যাটা নানা ঝঞ্ঝাটে এই ভাবে কাটলো। তার পর এলো খাওয়ার পালা। পালা না বলে খাওয়ার ঠ্যালা বলাই উচিত। আলু-ভাজা মনে করে যা চিবিয়েছি তা আলু নয়, কাঁচকলা। কাঁচকলার ভাজি। আলুর দম ভেবে যাকে গালে তুলেছি তা আলুর দম নয়, আলুরভ্রম—ওদের ছলনা। গালে ধরতে না ধরতেই গাল ধরলো, গলা ধরলো। পোস্তর বড়া খেয়েও আরেক পস্তানি। ঠিক যে তা কী বস্তু বলা আমার পক্ষে শক্ত। রন্ধন-বিজ্ঞানে আমি তেমন পোক্ত নই, তবে মনে হয় করাত-গুঁড়োর কোনো কারুশিল্প-টিল্প হবে।

অবশেষে ঝোলের বাটি ধরে টানলাম। মাছের কালিয়া দমন করা যাক এবার। মাছ জিনিষটার আঁচ পাবো ঠিকই। চিনিতে ঠকেছি, কিন্তু মাছ চিনিতে কোনো ভুল হবে না। মাছের মুড়োটাই তুলতে গেলাম আগে।

ছুঁতে না ছুঁতেই সেটা আপনা থেকেই পাতের ওপর লাফিয়ে আসে। পাতের থেকে লাফিয়ে ওঠে আমার মাথায়! আমার মাথার ওপরেই মুণ্ডপাত! শেষে দেখি মাছের মাথা নয়, কোলা ব্যাঙ্। তাও আবার খাঁটি না, ভ্যাজাল। সেলুলয়েডের—দম্ দেয়া।

এমনি করে, আগাগোড়া ওদের দুজনের হাসির অট্টরোলের মধ্যে নাকে মুখে দুটো গুঁজে ওঠা গেল। খাওয়ার ঠ্যালা শেষ করে শোবার পালা এবার। এখর বিছানায় গিয়ে লম্বা হতে পারলেই ল্যাঠা চোকে। হাত পা ছড়িয়ে একটু গড়িয়ে বাঁচি।

শোবার ঘরে ঢুকেই আমার দরজায় খিল দিলুম। জানালাগুলোও আঁটলুম ভালো করে ভেতর থেকে। কি জানি, রাত্রেও যদি ওদের রসিকতায় ঝামেলা সইতে হয়। বীরবল বলেছিলেন ঠিকই, রসিকরা রসি দিয়ে পায়। ওদের রসালুতার বাঁধে আর সিক দিয়ে বেঁধে। বাঁধা পড়েছি বটে, কিন্তু বিদ্ধ হইনি এখনো—ভয় একটা ছিলই প্রাণে। যদি কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে শিক-টিক এসে খোঁচা মারে—শিক্‌কাবাব বানিয়ে রাখে আমায়? সেই রসিকতার

পাল্লা সামলানোর চেয়ে আগেই জানলা-খড়খড়ির পাল্লা এঁটে রাখা ভালো।

পুরনো, কাঠের চারপায়া। কোনো সময়ে হয়তো খাট ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল চৌকিদারি করে এখন খাটিয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। মশারি খাটাবার ডাণ্ডা ছিলো চার ধারে, মশারি ছিল না।

শুয়েছি বিছানায়, কোনো রকমে একটু বিশ্রাম করে রাতটা কাটিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু পাশ ফিরতেই খাটটা খঁ্যাচ করে উঠলো, এক দিকের পায়া মচকেছে—প্রতিবাদ করেই সেদিকটা কাৎ! উঠে দেখতে গেছি, অন্য দিক থেকে আরেক হঁ্যাচকা টান। এক ধারের ডাণ্ডা এসে লাগলো আমার মাথায়। দেখতে না দেখতে আরেকটা পড়লো পিঠের ওপর। আর্তনাদ করে খাট থেকে নামতে যাবো, চারপায়াটা চারখানা হয়ে পড়লো আমার চার ধারে। পড়লো আমাব ঘাড়েই—তার ডাণ্ডা টাণ্ডা সমেত। আমি আর খাটের উপর নেই, খাটই আমার উপবে তখন। তার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমি সমাধিস্থ।

দরজার বাহির থেকে রসময়ের উচ্চহাসি কানে এল—সেই সুসময়ে। বিষময়েরও ফিকফিক শুনলাম। অত রাত্রে খাটকে আর নতুন করে খাটাবার উৎসাহ হোলো না—ঘুমোবার সময় কি কোনো খাটনি পোষায়?—খাট নিয়ে আর খাটতে না গিয়ে খাটের গর্ভেই যতটা আরামে পারা যায় কাত হওয়া গেল, খাটে না শুঁয়েই খাটসই রইলাম। মশারির ন্যায় খাটিয়া খাটিয়ে শুয়ে পড়লাম—অকাতরেই।

ঠিক করলাম, সকালে উঠেই এখান থেকে পিট্টান দেব—সকলের অজান্তে। ভোর না হতেই উঠে পড়েছি—চোরের মত বেরিয়েছি ঘর ছেড়ে। না, সদর দিয়ে নয়, কে জানে সেধারে যদি কোনো কল-কৌশল করা থাকে। দরজা খুলতে গিয়ে যদি সত্যই দরজা খুলে যায় —খুলে আসে আমার হাতেই—রসময়ের শ্রীহস্তের মতই? লোকে

বাড়ি চাপা পড়ে মরে শুনেছি। কিন্তু আমার ন্যায় দুর্বলহৃদয় লোকের পক্ষে একটা দরজার চাপই যথেষ্ট।

খিড়কি দিয়ে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। নিরাপদ অনেক। পা টিপে টিপে এগুলাম। পেছনের দরজা খুলে বাগানের ভেতর গিয়ে পড়েছি মাঝখান দিয়ে সরু একফালি পথ—খড়-কুটোয় ভর্তি। ঝরা পাতার স্বরাজ। চলতে গেলে মর্মরধ্বনি ওঠে। অভিশাপ দিতে থাকে বাগানটা। সাবধানে পা টিপে টিপে চলেছি বিচালি বিছানো একটা জায়গার ওপর দিয়ে যাচ্ছি—এমন সময়ে হঠাৎ······ঝপাং!

একেবারে পাত্‌কোর মধ্যে ধপাৎ! বিচালির বিছানা যে আসলে আমাকে মজানোর জন্যেই—তার তলায় যে পাত্‌কোর উৎপাত রয়েছে আমি ধরতে পারিনি।

ধরতে পারলাম, ধরা পড়বার পর। পাতকোর ফাঁদে পা দেবার পর—পাতালে গিয়ে একেবারে!

হায় হায়, বিভুঁয়ে এসে রসিকতার কবলে পড়ে মারা যেতে হোলো শেষটায়! আমি তো রসময়ের চিনি নই যে জলে পড়লেও ভাসবো? জলে পডলেই আমার জলাঞ্জলি! টুপ করে আমি ডুবে যাবো টপ্‌ করে, ঠিক মার্বেলের মতই! আমার ভারী কান্না পেতে থাকে।

কিন্তু না, ডুবতে হোলো না। রসময় কাছেই ছিল ওৎ পেতে। আমার পলায়ন-বার্তা এবং পতন-রহস্য কি করে যেন টের পেয়েছিলো। কি করে আগে থেকেই জেনেছিলো কে জানে। সেই এসে টেনে তুললো।

শীতের দিনের সূর্যের মত কাঁপতে কাঁপতে আমি উঠলাম।

"সদর পথেই বেরুতে পারতে। সকালে উঠে তোমার যে বেড়ানোর বদ্‌ভ্যাস আছে তা আমায় আগে কেন বলোনি?" সে আপশোষ করে: "আমার বন্ধুদের সবারই দেখছি এই এক

ব্যারাম। প্রাতঃভ্রমণের বদ খেয়াল। আর, কেন জানি না, সকলেই এই খিড়কির পথটাই বেছে নেয়।"

পৌষ-মাসের সকালে সিক্ত কাপড়-জামায় কাঁপছি—"না, বন্ধু, না। প্রাতঃ ভ্রমণ নয়, প্রাতঃ কালের ভ্রমও না। সকালে উঠে চান করার আমার বাতিক। তাই ভাবলুম প্রাতঃস্নানটা সেরে আসি।" কাঁপতে কাঁপতে বলি।

এই ঠকাটাই বড়ডো জোর হয়েছিল—-হাতে পায়ে দাঁতে দাঁতে—ঠক ঠক করছি তখনো।

না খেয়ে নেমন্তন্নে যেতে নেই !

"নতুন রেস্তরাঁ খুলেছি ভাই। নেমন্তন্ন করতে এলাম তোমায়।" নিবারণ এসে জানালো।

নেমন্তন্নের কথায় লাফিয়ে উঠি—"বলো কি হে ?"

"সব পাবে আমার রেস্তোরাঁয়।" হাতের খাদ্যতালিকা থেকে সে উদাহরণমালা উদ্ধার করতে থাকে—"চপ্, কাট্‌লেট, কারি-কোর্মা, মাম্‌লেট, ফিশ্‌ফ্রাই, মাটন এবং পাঁঠন—"

"পাঁঠনটা কী ?" বাধা দিয়ে জানতে যাই।

"পাঁঠা। সাদা বাংলায়। তবে তোমার ভাষাতেই বলছি কিনা ! যাতে তুমি অনায়াসে বুঝতে পারো। বলতে না বলতেই সহজে তোমার বোধগম্য হয়। তারপর আবার কাট্‌লেট। কাট্‌লেট দু' প্রকারের—চিংড়ির ও চ্যাংড়ার।"

"চ্যাংড়ার ? তার মানে ?" আমি ভড়কে যাই। পাড়ার ছেলেদের ধরে ধরে কাটছে নাকি ও ? আমার ভাষা, ওর ভাষনে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার ধারণা ছিলো, এক পরীক্ষার খাতায় ছাড়া ছেলেরা আর সর্বত্রই অকাট্য।

"আহা, ঐ চিংড়ির কাট্‌লেটই। তাই আমাদের চ্যাংড়াদের জন্য। চ্যাংড়া যারা, তারা চিংড়ির পেছনে ছুটবে এ তো স্বাভাবিক। আবার তারা সস্তাও চাইবে। তাই তাদের জন্যে কুঁচো চিংড়ির কাটলেট। আর তোমাদের জন্য গলদার। তবে তোমাদের আবার অন্যরকমও আছে—ব্রেস কাটলেট।"

আমি বলি ঃ "ব্রেশ।" বেড়ে আর বেশ সন্ধি করে—একসঙ্গে পাকিয়ে—কাট্‌লেটের মত করেই বলা আমার।

"পেঁয়াজী থেকে দোপেঁয়াজী—সব পাবে। পটাটো চপ্ থেকে পটাটো চিপ্‌স্—যা চাই রামপাখীও।"

রামপাখীর নামে আমার রাম পাখা গজায়। তক্ষুনি এক্ষুনি যেন উড়ে যেতে ইচ্ছে করে ওর পাকশালায়। দুরন্ত উদর হাত পা ছড়িয়ে উড়ন্ত হতে চায়। উধাও হতে চায় ওর পাখীস্থানের দিকে।

"যেয়ো না, দেখতে পাবে। রামপাখীরা কেমন উড়ছে আমার রেস্তর্াঁয়।" হাসতে হাসতে জানায় সে।

উড়ছে, "বলো কি? ঠুকরে দেবে না তো?" ভয় করে আমার।

"উড়ছে বটে, তবে এমনি নয়। কাট্‌লেট হয়েই উড়ছে। ঠোকরায় না, ঠুকৃত হয়। তোমাদের দ্বারাই হয়ে থাকে।"

আমার ভাষার প্লাবনে নিবারণ আমাকেই ভাসায়। নিবারণ করা যায় না—কিছুতেই।

"কবে যেতে হবে?" ভাসতে ভাসতে বলি।

"খোলাই আছে রেস্তর্াঁ।" হাসতে হাসতে জানায় সে ঃ "তবে পয়লা বোশেখ এসো। শুভ উদ্বোধন কিনা সেদিন। অনেকরকম খাবার-দাবার হবে। বিকেলের দিকেই এসো, কেমন?" বলে গেল নিবারণ।

এবারে পয়লা বোশেখ ছিল শুক্কুরবার। গুডফ্রাইডের ঠিক সাত দিন পরে। নিবারণের সৌজন্যে এটাকে বেটার ফ্রাইডে বলা যেতে পারে।

তার আগের দিন থেকেই নেমন্তন্ন রক্ষার তোড়জোড় সুরু করলাম। বেস্পতিবারের বারবেলা পড়তেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলাম সব।

বিকেলের জলখাবার বাদ গেল, রাত্রের রুটিও বরবাদ! শোবার

আগে নৈশপান হর্লিকস্—তাও বাতিল ! তিল তিল খেয়ে যদি পেট ভর্তি করি তাহলে কাল বিকালে নিবারণের তাল সামলাবো কি করে ?

সকালে বাসার চাকর ডিমের হাফ্‌বয়েল নিয়ে এলো, তাও হটিয়ে দিলাম আম্লানবদনে। নিবারণের নেমন্তন্ন না আজ ? হাফ্‌বয়েল খেয়ে পেট ভার করব এমন আস্ত 'বয়েল' আমি নই।

দুপুরেও হরিমটর। আর বিকেলে? তখন তো আমার পেটে চোঁ চোঁ খিদে ! আমি চিঁচিঁ করছি। একটা চিংড়ির ক্যাট্‌লেট পেলেও চিবিয়ে বাঁচি—যদিও শুনেছি নাকি তা নাকি আমাদের জন্যে নয়, চ্যাংড়াদের জন্যেই।

সন্ধ্যে নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম রেস্তরাঁয়। শুভ উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে।

দোর গোড়াতেই পাওয়া গেল নিবারণকে। অভ্যর্থনা সমিতি হয়ে একাই সে সদরে দাঁড়িয়ে।

"কী হে, তোমার উদ্বোধনের কদ্দুর ?

"তুমি এলেই হয়।" ও জানালো।—"ভেবেছিলুম কাটজু সাহেবকে দিয়ে উদ্বোধন করাবো। তিনি নাকি সব কিছুর উদ্বোধন করেন—জুতোর দোকান থেকে চণ্ডীমণ্ডপের।"

"ভালই হোতো তাহলে।" আমি বলি ঃ 'লাট সাহেবরাই তো উদ্বোধন-সম্রাট আজকাল।"

"হাঁ, সব কাজের কাজী। সব কাজেব কাট্‌জুও বলতে পারো। কিন্তু পাড়ার সবাই বাধা দিলো আমায়। বল্লে, পেয়েছো কি তুমি ? হুট বল্লেই তিনি ছুটে আসবেন ? লাটসাহেব কি তোমার কাটলাট নাকি ? আমার কাট্‌লেটের নাম খারাপ করে ওই কথা তারা বল্‌লো। তোমার ভাষাতেই বললো বলে মনে হচ্ছে। যাক্ গে বলুক গে ! অগত্যা…"

শুনতে শুনতে আমি রেস্তরাঁর ভেতরে এসে বসেছি।

"অগত্যা ঠিক করলাম," এক প্লেটে গোটা কয়েক কাজু বাদাম এগিয়ে দিলো ও ঃ "এখন এই কাটজু বাদাম দিয়েই তোমার শুভ উদ্বোধন হোক্।"

বাদামগুলো পেটের আগুনে পড়লো যেন ঘিয়ের ছিটের মতই। আসল খাদ্যের আহুতির আশায় ওর দিকে তাকাতে গিয়ে সামনের দেয়ালে নজর ঠেকলো আমার। সেখানে একটা কার্ড-বোর্ড লটকানো, তাতে লেখা—

আজ নগদ কাল ধার

এ আবার কী বাবা ? নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে এ কেমন কথা ? মুখে না বলে ঘুরিয়ে বলা সম্মুখে ? আর ঐ ভাবে ? ডেকে এনে ডকে তোলা—এ কি রকমের ভদ্রতা ?

ভাবলাম রেস্তরাঁর অন্যধারে বসি গিয়ে—যাতে ওটা আমার চোখে না পড়ে। চোখকে না পীড়া দেয়। কিন্তু তাতেই বা কি ! স্মৃতিশক্তি বলে একটা জিনিস আছে তো ? এমন কি—খুব কম হলেও—আমারো আছে। যে ধারেই বসো, তোমাকে নগদ্ বসতে হবে একথা মনের মধ্যে গঁদের মত এঁটে থাকে, সেখান থেকে মোছা যায় না কিছুতেই।

ভাবতেই খিদে আমার মাথায় উঠে যায় !

দেয়ালের মাথায় তাকিয়ে আছি, খেয়ালের মাথায় ওরও চোখে পড়ছে কখন্ !

"হ্যাঁ ভাই, ওটা লাগাতে হোলো—বাধ্য হয়েই। আগে আমি বসিরহাটে চায়ের দোকান খুলেছিলাম, সেখানকার লোকে ধারে খেয়ে খেয়ে বসিয়ে দিলো আমায়। বন্ধুদের ধার দিলে আর তারা ধার মাড়ায় না, জানো তো ? আবার এখানে ধারে খাওয়ালে কোনোদিন কি আর উদ্ধার পাবো ? তোমাদের বন্ধুত্ব আমি অমূল্য জ্ঞান করি—তারপর যদি তোমারা ধারে খাও তার মূল্য আরো বেড়েই যাবে দিনকের দিন। তখন সেই বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করা কি সম্ভব হবে কখনো ? না ভাই, তোমাদের বহুমূল্য বন্ধুত্ব আমি হারাতে পারবো না। আমাকে তোমরা মাফ করো।"

নিবারণের অমন বক্তৃতার পর আমাকে পকেট হাতড়াতে হোলো। নিবারণের নয়, নিজের। টাকা সিকি, দুয়ানি, ডবল পয়সা, আধুলি, আনি, ফুটো পয়সা সব মিলিয়ে গোটা পাঁচ দাঁড়াবে আঁচ পাওয়া গেল।

"ঠিক কথা! বন্ধুকে বন্ধু না রাখিলে কে রাখিবে? আনো তোমার খাবার, নগদ্ নগদ্। কুছ পরোয়া নেই! দেখি খাদ্যতালিকা আজকের?" পকেট থেকে হাত বের করে বল্লাম।

নিলাম হাতে খাদ্যতালিকা। ফাউল রোস্টের তলায় দাগ মেরে দিলাম ওকে ছেড়ে।

রোস্টের ফরমাস দিয়ে রেস্ট্ নিচ্ছি—খিদের বেড়া আগুনের মধ্যে। কিন্তু এক প্লেট আনতে নিবারণ এত লেট খাবে কে জানতো! মুর্গি-জবাই করেই বানিয়ে আনছে নাকি?

টেবিলের কাগজগুলো নাড়তে লাগলাম। নতুন আর পুরোনো খবর-কাগজ জড়ো করা যতো রাজ্যের।···পাটনায় আকাশ থেকে মাছ-বর্ষণ হয়েছে। কলকাতায় মাছ বিরল। কলকারখানার ধর্মঘট। ধর্মতলায় মোটর চাপা পড়েছে একজনা।···

নিবারণ ফিরে এলো তালিকা হাতে। আমার সামনে পেন্সিল দিয়ে কেটে দিলে রোস্টের নাম—তার তালিকার থেকে।

"নেই ভাই। এই কেটে দিলুম। ফুরিয়ে গেছে আমার রোস্ট্।"

"বেশ। তাহলে নিয়ে এসো তোমার সেই ব্রেস কাটলেট, বেস্ট চীজ, তাই খাবো।"

চলে গেলো নিবারণ। দাগমারা তালিকা হাতে।

বসে আছি। পড়ছি খবরের কাগজ।···পণ্ডিত নেহরুর পায়ে কড়া পড়েছে। ম্যাট্রিকের অংকের প্রশ্ন এবার কড়া হয়েছে বেজায়। পরীক্ষার হলেও দারুণ কড়াকড়ি। কেউই কিছুতে প্রসন্ন নন।

"না ভাই, কাটলেটও নেই। ফুরিয়ে গেছে সব। ভারি কাটতি আমার কাটলেটের।" নিবারণ এসে জানায়—মিনিট দশেক বাদে। সঙ্গে সঙ্গে তালিকার থেকে কাটলেটের নামটা কাটা পড়ে।

তালিকাটা ওর হাত থেকে নিলাম। তাকিয়ে দেখলাম। খতিয়ে দেখি, নিজের বেশী ক্ষতি না করে কী কী খাওয়া যায় আর?—"আচ্ছা, একটা মাটন্ চপ খাওয়া যাক। কী বলো? মাটনের চাপ—সইতে পারব তো?"

"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।"—বলে নিবারণ ফের অনুযোগ করে: "তবে তোমার কথা বলতে পারি না। তোমার তো শরীর নয়, কলেবর।"—বলেই সে চলে যায়।

আবার পড়ছি মন দিয়ে কাগজ।...আগ্রার নাপিতরা কামাতে রাজী নয়। উড়েরা কলকাতায় কিন্তু বেশ কামাচ্ছে—দাড়ি নয়, টাকা। আমাদের টাকাকড়ি যে কোন দিক দিয়ে উড়ে যায় জানা যায় না—আমি না-কামানো গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবি।

নিবারণ এসে হাজির—খালি হাতে।—"না মাটনও নেই, ফুরুৎ! পাঁঠন আনবো?"

"পাঁঠন্? তাই আনো।"

মাটন চপের নাম কাটা পড়লো তালিকার থেকে। মাটন কেটে পাঁঠন আনতে ছুটলো সে। আবার আমার কাগজপাঠ। এবারে কতকগুলো কিশোর মাসিক নিয়ে পড়লাম।

দেখি সমস্ত ধাঁধার উত্তর ভুল হয়েছে আমার। সম্পাদকের কাছে পাঠানো সব কবিতা অমনোনীত। রামধনু, মৌচাক, শুকতারা—সব জায়গাতেই সমান তাড়না আমার ভাগ্যে। সুখ নেই কোনোখানেই। কেউ নাম ছাপায় না। নাহক এদের গ্রাহক হওয়া—দেখছি এখন।

অনেকক্ষণ পরে ফেরত এলো নিবারণ। "না নেই। তোমার পাঁঠনও নেই।" জানালো এসে পত্রপাঠ।

"দাও আমাকে।' ওর হাত থেকে কাগজখানা নিই—"এবার আমি নিজে কাটি।" বলে তালিকার পিঠে পাঁঠার চপের ওপর আমার পেনসিল চালাই। ভালো কর কেটে দিই কালো করে। তালিকার থেকে তালাক্ দি।

"ভারী কাটতি কিনা আমার দোকানে !" কৈফিয়তের সুরে ও জানায়।

"তাই আমিই কাটলাম—আমার হাতেও কিছু কাটতি হোক।"

"ভালোই করছো—তবু যাহোক একটু বউনি হোলো তোমার হাতে।" বলে তালিকাটা ও নিলো।

"তাহলে আর কী আছে তোমার রেস্তরাঁয়?" পেটের জ্বালায় আমি জ্বলে উঠি।—"পটাটো চপ্? পটাটো চিপ্? দোপেঁয়াজি? এক পেঁয়াজি? আর কিছু না থাকে, তোমার পেঁয়াজিই কিছু ছাড়ো নাহয় ভাই।"

"দেখি কী আছে, দাঁড়াও।' বলে ফের চলে চায় ও।

ওর কথায় অবশ্যি আমি দাঁড়াইনে। বসেই থাকি। বসে বসেই হাতে পায়ে খিল লাগার যোগাড়, এর পর ফের দাঁড়াতে হলেই তো হয়েছে!

আবার পড়াশুনায় মন দিই। খিদেটা ভুলে থাকা যায় যতক্ষণ। কাগজ চাপা দিয়ে নিবারণ করা যায় যতখানি।...

কালোবাজারের চাহিদা বেশি—পড়ি খবরের কাগজে। ভালো জিনিসের কদর নেই। জিনিসের দর চড়ছেই। লেখাপড়ার চর্চা কমছে। শিলচরের এক ছাত্রী তার মাষ্টারনীকে কিল চড় বসিয়েছে বলে জানা গেল।...

নিবারণকে চপেটাঘাত করলে কেমন হয়? ওর পটাটো চপের এক ঘা? কসে ওর মুখের ওপর বসাই যদি?

বসে আছি তো বসেই আছি, অনেকক্ষণ বাদে নিবারণ এসে খাড়া হয়। খালি হাতে। একেবারে খালি হাত না—পেনসিল আর খাদ্যতালিকাটি আছে। "ভাই, ভারি দুঃখের বিষয়—" ও মুখ ভার করে সুরু করে।

"কিচ্ছু বলতে হবে না। কাট্‌তির কথা আমার জানা আছে। তোমার খাদ্যতালিকার তলায় আমার নামটা লেখো দেখি এবার।"

"তোমার নাম ?"

"হ্যাঁ, লেখো না—যা বলছি !

লেখে সে—একটু আপত্তির সঙ্গেই। "আমার তালিকায় তোমার নাম কেন ? তোমার নাম লিখবো কেন ? তুমি কি একটা খাদ্য ?" লিখতে লিখতে সে বলে।

"অখাদ্য হলেও লিখতে কী ? খেতে তো আর পাচ্ছি নে। তুমি লেখো।"

নিবারণ লিখলো।

"এইবার কেটে দাও—পেন্‌সিল দিয়ে।" আমি বলি। "বেশ ভালো করে কাটো।"

"তার মানে ?'

"তার মানে—আমিও আর নেই এখন।"

নিবাবণ কাটে একটুও দ্বিধা না করে। এতদিন ধরে খাদ্যাখাদ্যের কাটাকুটিতে ওর হাত পাকা হয়েছিল। অভ্যেস যাবে কোথায় ?

সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেটে পড়ি। আমারও কাটতি হয়ে যায়—দেখতে না দেখতেই !

আমার বাঘ শিকার !

"একবার আমাকে বাঘে পেয়েছিলো। বাগে পেয়েছিলো একেবারে···"

আমার আত্মচরিত আরম্ভ হয়।

এতক্ষণ আমাদের চার ইয়ারি আড্ডায় আর সকলের শিকার-কাহিনী চলছিলো। জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে যে যার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছিলেন। আমার পালা এলো অবশেষে।

অবশ্যি সবার আগে সুরু করেছিলেন এক ভালুক-মার। তাঁর গল্পটা সত্যিই খুব রোমাঞ্চকর। ভালুকটা তাঁর বাঁ হাতখানা নিজের গালে পুরে চিবোচ্ছিল কিন্তু তিনি তাতে একটুও না ঘাবড়ে গিয়ে এক ছুরির ঘায়ে ভালুকটাকে কাবার করলেন। ডান হাত দিয়ে—তাকে হাতিয়ে।

আমি আড় চোখে তাঁর বাঁ হাতের দিকে তাকালাম। সেটা যে কখনো কোনো ভালুক মন দিয়ে মুখস্থ করেছিল তার কোনো চিহ্নই সেখানে নেই।

না থাক, আমার মনের বিস্ময় দমন করে আমি জিজ্ঞেস করি: "ভালুক কি আপনার কানে কানে কিছু বলেছিলো ?

"না। ভালুক আবার কী বলবে ?" তিনি অবাক হন।

"ওরা বলে কি না, ওই ভালুকরা।" আমি বলি: "কানাকানি করা ওদের বদভ্যাস। পড়েন নি কথামালায় ?"

"মশাই, এ আপনার কথামালার ভালুক নয়। আপনার শপ কিংবা গাঁজার শপ্ পান নি।" তাঁর মুখে চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে।—"আস্ত ভালুক। একেবারে জলজ্যান্ত।"

ভালুক শিকারীর পর সুরু করলেন এক কূর্মবীর—তাঁর কচ্ছপ ধরার কাহিনী। তাঁরটাও জলজ্যান্ত। জল থেকে জ্যান্তই তিনি তুলেছিলেন কচ্ছপটাকে।

কচ্ছপটা জলের তলায় ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। হেদো-গোলদীঘির কোথাও হবে। আর উনি ডাউভ খাচ্ছিলেন—যেমন খায় লোকে। খেতে খেতে একবার হোলো কি, ওর মাথাটা গিয়ে কচ্ছপের গায়ে ঠক্ করে ঠুকে গেল। সেই ঠক্কর না খেয়ে তিনি রেগেমেগে কচ্ছপটাকে এক টানে টেনে তুললেন জলের থেকে।

"গাঁজার এক টানে?" আমি শুধোলাম।

"ইয়া প্রকাণ্ড এক বিশমণী কাছিম! বিশ্বাস করুন আর না করুন।" —তিনি বল্লেন। "একটুও গাঁজা নয়, নির্জলা সত্যি। জলের তলা থেকে আমার নিজের হাতে টেনে তোলা। এই হাতে।"

"অবিশ্বাস করবার কী আছে?' আমি বলি: "তবে নির্জলা সত্যি এমন কথা বলবেন না।"

"কেন বলব না কেন?" তিনি ফোঁস করে উঠলেন।—"শুনি তো?"

"আজ্ঞে, নির্জলা হয় কি করে? জল্ তো লেগেই ছিলো কচ্ছপটার গায়।" আমি সবিনয়ে জানাই।—"গা কিংবা খোল—যাই বলুন সেই কচ্ছপের।" আমি আরো খোলসা করি।

তারপর আরম্ভ করলেন এক মৎস্য অবতার—তাঁর মাছ ধরার গল্প। মাছ ধরাটা শিকারের পর্য্যায়ে পড়ে না তা সত্যি, কিন্তু আমাদের আড্ডাটা পাঁচ জনের। আর, তিনিও তার একজন। তিনিই বা কেন বাদ যাবেন? কিন্তু মাছ বলে তাঁর কাহিনী কিছু ছোটখাটো নয়। এইসা পেল্লায় সব মাছ তিনি ধরেছেন, সামান্য ছিপে আর নামমাত্র পুকুরে—যা নাকি ধর্তব্যের বাইরে। তার কাছে তিমি কোথায় লাগে!

"তুমি যে-তিমিরে তুমি সে-তিমিরে!" আমি বলি। আপন মনেই বলি—আপনাকেই।

মাছটা যতই তাঁর চার খেতে লাগলো, তাঁর শোনাবার চাড় বাড়তে লাগলো ততই। তাঁর কি, তিনি তো মাছ ধরতে লাগলেন আর ধরে ছাড়তে লাগলেন—আকচার। তাঁর মাছ তো আমরা খেতে পেলুম না, কেবল তার কাঁটাগুলো আমাদের গলায় খচখচ করতে লাগলো।

তাঁর Fish-ফিসানি ফিনিশ হলে আমরা বাঁচলাম।

কিন্তু হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তে সুরু হোলো এক গণ্ডারবাজের। মারি তো গণ্ডা-র—কথায় বলে থাকে! তিনি এক গণ্ডার দিয়ে শুধু গণ্ডা রটাকেই নয়, আমাদেরকেও মারলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরাও এক গণ্ডার কম ছিলাম না।

এক গণ্ডারের টেক্কায়—একটি ফুৎকারে আমাদের চার জনকেই যেন তিনি উড়িয়ে দিলেন। চার জনার পর আমার পালা এলো।

নাচার হয়ে আরম্ভ করতে হোলো আমায়।

"হ্যাঁ, শিকারের দুর্ঘটনা আমার জীবনেও যে না ঘটেছে তা নয়, আমাকেও একবার বাধ্য হয়ে···"

আমার শিকারোক্তি সুরু করি।

"মাছ, না মাছি?" মাছের ব্যাপারী প্রশ্ন তোলেন।

আমি অস্বীকার করি—"মাছ? না, মাছ না। মাছিও নয়। মশা, মাছি, ছারপোকা কেউ কখনো ধরতে পারে? ওরা নিজগুণে ধরা না দিলে ধরবার সাধ্যি আছে কারু?"

"তবে কি? কোনো আর্সোলা-টার্সোলাই হবে বোধ হয়?"

"আর্সোলা? বাব্বা, আর্সোলার ধার-কাছ কেউ ঘ্যাঁষে?" বলতেই আমি ভয়ে কাঁপি। —"না, মশাই আর্সোলার ত্রিসীমানায় আমি নেই। তারা ফর্‌ফর্‌ করলেই আমি সফরে বেরিয়ে পড়ি। দিল্লী কি আগ্রা অদ্দূর যাই নে, যেতেও পারি নে, তবে হ্যাঁ, বালিগঞ্জ কি বেহালায় চলে যাই। তাদের বাড়াবাড়ি থামলে, ঠাণ্ডা হলে, বাড়ি ফিরি তারপর।"

"তা হ'লে আপনি কী শিকার করেছিলেন, শুনি?" হাসতে থাকে সবাই।

"এমন কিচ্ছু না, একটা বাঘ।" আমি জানাই: "তাও সত্যি বলতে, আমি তাকে বাগাতে যাই নি, চাইও নি। বাঘটাই আমাকে ······মানে, বাধ্য হয়ে আমাকে······মানে কিনা, আমার দিকে একটুও ব্যগ্রতা না থাকলেও শুধু কেবল ও-তরফের ব্যাঘ্রতার জন্যেই আমাকে ওর খপ্পরে পড়তে হয়েছিলো। এমন অবস্থায় পড়তে হোলো আমায় যে তখন আর তাকে স্বীকার না করে আমার উপায় ছিল না···"

আরম্ভ হয় আমার বাঘাড়ম্বর।

"···তখন আমি এক খবর-কাগজের আপিসে কাজ করতাম। নিজস্ব সংবাদ-দাতার কাজ। কাজ এমন কিছু শক্ত না। সংবাদের বেশির ভাগই গাঁজায় দম দিয়ে মনশ্চক্ষে দেখে লেখা—এই যেমন, অমুক সহরে মাছবৃষ্টি হয়েছে, অমুক গ্রামে এক পায়ে ক্ষুরওয়ালা মানুষ জন্মেছে (স্বভাবতঃই সে নাপিত নয়), কোন্ গহন অরণ্যে এক অতিকায় মানুষ দেখা গেল, মনে হয় মহাভারতের আমলের কেউ হবে, হিড়িম্বা-ঘটোৎকচ-বংশীয়। কিংবা একটা পাঁঠার পাঁচটা ঠ্যাং বেরিয়েছে অথবা গোরুর পেটে মানুষের বাচ্চা—মানুষের মধ্যে যে সব গোরু দেখা যায় তার প্রতিশোধ-স্পৃহাবশতই হয়ত বা—দেখা দিয়েছে কোথাও! এই ধরণের মুখরোচক যত খবর। 'আমাদের ষ্টাফ রিপোর্টারের প্রদত্ত সংবাদ' ব'লে কাগজে যা সব বেরোয় সেই ধারার আর কি! আজগুবি খবরের অবাক জলপান!···"

"আসল কথায় আসুন মশায়।" তাড়া লাগালো ভালুকমার।

"আসছি তো। সেই সময়ে গৌহাটির এক পত্রদাতা বাঘের উৎপাতের কথা লিখেছিলেন সম্পাদককে। তাই না পড়ে তিনি আমায় ডাকলেন, বল্লেন, 'যাও তো হে, গৌহাটি গিয়ে বাঘের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জেনে এসো তো! নতুন কিছু খবর দিতে পারলে কাগজের কাটতি হবে খুব এখন।'

"গেলাম আমি—কাগজ, পেন্‌সিল আর প্রাণ হাতে করে। চাকরি করি, না গিয়ে উপায় কি ?

"সেখানে গিয়ে বাঘের কীর্তিকলাপ যা কানে এলো তা অদ্ভুত। বাঘটার জ্বালায় কেউ নাকি গোরু-বাছুর নিয়ে ঘর করতে পারছে না। সহরতলীতেই তার হাম্‌লা বেশী, তবে ঝামেলা কোথাও কম নয়। মাঝে মাঝে সহরের এলাকাতেও সে টহল দিতে আসে। হাওয়া খেতেই আসে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু হাওয়া ছাড়া অন্যান্য খাবারেও তার তেমন অরুচি নেই দেখা যায়। একবার এসে এক মনোহারী দোকানের সব কিছু সে সাফ করে গেছে। সাবান, পাউডার, স্নো, ক্রীম, লুডো, দাবা খেলার সরঞ্জাম—কিচ্ছু রাখে নি। এমন কি, দোকানীর সখের হারমোনিয়াম্‌টাও সাথে করে নিয়ে গেছে।

"আরেকবার বাঘটা একটা গ্রামোফোনের দোকান ফাঁক করলো। রেডিয়ো সেট্‌, লাউডস্পীকার, গানের রেকর্ড যা ছিলো, এমন কি পিন্‌গুলি পর্যন্ত সব হজম, সে সবের কোনো আর চিহ্ন পাওয়া গেল না।

"আমি যেদিন পৌঁছলাম সেদিন সে এক খাবারের দোকান সাবাড় করেছিল। সন্দেশ-রসগোল্লার ছিটেফোঁটাও রাখে নি, সব কাবার। আমি তক্ষুনি বাঘটার আশ্চর্য খাদ্যরুচির খবরটা তার-যোগে কলকাতার কাগজে পাচার করে দিলাম।

"আর, এই খবরটা রটনার পরেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। এক চিড়িয়াখানার কর্তা লিখলেন আমাকে—আমি বা গৌহাটির কেউ যদি এই অদ্ভুত বাঘটাকে হাতে নাতে ধরতে পারি—একটুও হতাহত না করে,—আর আস্ত বাঘটাকে পাকড়াও করে প্যাক্ করে পাঠাতে পারি তা হলে তাঁরা প্রচুর মূল্য আর পুরস্কার দিয়ে তাকে নিতে প্রস্তুত আছেন।

"আর, হ্যাঁ, পুরস্কারের অঙ্কটা সত্যিই খুব লোভজনক—বাঘটা যতই ভয়াবহ হোক না! যদিও হতাহত না করে—এবং না হয়ে—

খালি হাতাহাতি করেই বাঘটাকে হাতানো যাবে কিনা সেই এক সমস্যা।

"খবরটা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। গৌহাটির বড় বড় বাঘশিকারী উঠে পড়ে লাগলেন বাঘটাকে পাকড়াতে।

"এখানে বাঘাবার কায়দাটা একটু বলা যাক্। বাঘরা সাধারণতঃ জঙ্গলে থাকে, জানেন নিশ্চয়? কোনো কিছু বাগাতে হলেই তারা লোকালয়ে আসে। শিকারীরা করে কি, আগে গিয়ে জঙ্গলে মাচা বেঁধে রাখে। আর সেই মাচার কাছাকাছি একটা গর্ত খুঁড়ে—সেই গর্তের ওপরে জাল পেতে রাখা হয়। আবার শুক্নো লতাপাতা, খড়কুটো বিছিয়ে আরো একটু জালিয়াতি করা হয় তার ওপর। বাঘটা ঐ পথে ভ্রমণ করতে এলে পথভ্রমে ঐ ছলনার মধ্যে পা দেয়—ফাঁদের মধ্যে পড়ে নিজেকে জলাঞ্জলি দিতে একটুও দ্বিধা করে না।

"অবশ্যি, বাঘ নিজগুণে ধরা না পড়লে, মানে, নিজের দোষে ঐ প্যাঁচে পা না দিলে অক্ষত তাকে ধরা একটু মুস্কিলই হয় বই কি! তখন সেই জঙ্গল ঘেরাও করে দলকে দল হৈ চৈ বাধায়। জঙ্গলের চারধার থেকে হট্টগোল করে বাঘটাকে তারা তাড়া দেয়—তাড়িয়ে তাকে সেই অধঃপতনের মুখে ঠেলে নিয়ে আসে। সেই সময়ে মাচায়-বসা শিকারী বাঘটাকে গুলি করে মারে। নিতান্তই যদি বাঘটা নিজেই গর্তে পড়ে হাত-পা ভেঙে মারা না পড়ে তা হলেই এমনটা হয়ে থাকে।

"তবে বাঘ এক এক সময়ে গোল করে বসে তাও ঠিক। ভুলে গর্তের মধ্যে না পড়ে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ে—শিকারীর ঘাড়ের ওপর। তখন আর গুলি করে মারার সময় থাকে না, বন্দুক দিয়েই মারতে হয়। বন্দুক, গুলি, কিল, চড়, ঘুষি—যা পাওয়া যায় হাতের কাছে তখন। তবে কিনা, কাছিয়ে এলে বাঘ এসব মারামারির তোয়াক্কাই করে না। বিরক্ত হয়ে বন্দুকধারীকেই মেরে বসে—থাবার এক থাবড়াতেই সাবড়ে দেয়। কিন্তু পারৎপক্ষে বাঘকে সে

রকমের সুযোগ দেওয়া হয় না,—দূরে থাকতেই তার বদ্‌-মৎলব গুলিয়ে দেওয়া হয়।

"এই হোলো বাঘাবার সাবেক কায়দা। বাঘ মারো বা ধরো যাই করো—তার সেকেলে সার্বজনীন উৎসব হোলো এই। গৌহাটির শিকারীরা সবাই এই ভাবেই বাঘটাকে বাগাবার তোড়জোড়ে লাগালেন।

"আমি সেখানে একা। আমার লোকবল, অর্থবল কিছুই নেই। সদলবলে তোড়জোড় করতে হলে টাকার জোর চাই। টাকার তোড়া নেই আমার, তবে হ্যাঁ, আমার মাথার জোড়াও ছিল না। বুদ্ধি-বলে বাঘটাকে বাগানো যায় কি না আমি ভাবলাম।

চলে গেলাম এক ওষুধওলার দোকানে—বল্লুম, 'দিন তো মশাই, আমায় কিছু ঘুমের ওষুধ।'

'কার জন্যে?'

'ধরুন, আমার জন্যেই। যাতে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা অকাতরে ঘুমোনো যায় এমন ওষুধ চাই আমার।'

"বাঘের জন্যে চাই কথাটা আমি বের্ফাস করতে চাইলাম না। কি জানি যদি লোক-জানাজানি হয়ে সমস্ত প্লানটাই আমাব ভেস্তে যায়! তারপর গুজব যদি একবার রটে যায় হয়তো সেটা বাঘের কানেও উঠতে পারে, আর বাঘটা টের পেয়ে হুঁসিযার হয়ে যায় যদি?

"তা ছাড়া আমাকে কাজ সারতে হবে সবার আগে, সব চেয়ে চটপট্, আর সকলের অজান্তে। দেরি করলে পাছে আর কেউ শিকার করে ফ্যালে বা বাঘটা কোনো কারণে কিংবা মনের দুঃখে নিজেই আত্মহত্যা করে বসে—তা হলে এমন দাঁওটা ফসকে যাবে—সেই ভয়টাও ছিল।

"ওষুধটা হাতে পেয়ে তার পরে আমি শুধালাম—'একজন মানুষকে বেমালুম হজম করতে একটা বাঘের কতক্ষণ লাগে বলতে পারেন?'

'ঘণ্টা খানেক। হ্যাঁ, ঘণ্টা খানেক তো লাগবেই।'

'আর বিশ জন মানুষ?'

'বিশ জন? তা দশ-বিশটা মানুষ হজম করতে অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক লাগা উচিত—অবশ্যি যদি তার পেট আঁটে তবেই।' জানালেন ডাক্তার বাবু। 'তবে কিনা, এত খেলে হয়তো তার একটু বদ্-হজম হতে পারে। চোঁয়া ঢেঁকুর উঠতে পাবে এক-আধটা।'

"তাহলে বিশ ইনটু তিন ইনটু আট—মনে মনে আমি হিসেব করি—হোলো চারশ' আশি। একটা বাঘের হজম-শক্তি ইজ ইকোয়াল টু চারশ' আশিটা মানুষ। তার মানে চার শ'আশিটা হজম-শক্তি। আর হজম-শক্তি ইজ ইকোয়াল্ টু ঘুমোবার ক্ষমতা।

"মনে মনে অনেক কষাকষি করে আমি বলি 'আমাকে এই রকম চারশ' আশিটা পুরিয়া দিন তো। এই নিন ওষুধের টাকা। পুরিয়ার বদলে আপনি সব ওষুধটা একটা বড় প্যাকেটেও পুরে দিতে পারেন।"

"ডাক্তার বাবু ওষুধটা আমার হাতে দিযে বল্লেন, 'আপনি এর সবটা খেতে চান, খান আমার আপত্তি নেই। তবে আপনাকে বলে দেওয়া উচিত যে এ খেলে যে প্রগাঢ় ঘুম আপনার হবে তা ভাঙাবার ওষুধ আমাদের দাবাইখানায় নেই। আপনার কোনো উইল-টুইল করবার থাকলে করে খাবার আগেই তা সেরে রাখবেন এই অনুরোধ।'

"ওষুধ নিয়ে চলে গেলাম আমি—মাংসের দোকানে। সেখানে আস্ত একটা পাঁঠা কিনে তার পেটের মধ্যে ঘুমের ওষুধের সবটা দিলাম সেঁধিয়ে,—তার পরে তার পেট সেলাই করে তাকে নিয়ে জঙ্গল আর সহরতলীর সঙ্গমস্থলে গেলাম। নদীর ধারে বাঘটার জল খাবার জায়গায় রেখে দিয়ে এলাম

পাঁঠাটাকে। জল খেতে এসে জলখাবার পেলে বাঘটা তো আনন্দে চার পা তুলে লাফাবে। পাঁঠাটাকে কি আর খাবেনা?

"ভোর না হতেই সেই সঙ্গমস্থলে গেছি—বাঘটার জলযোগের জায়গায়। গিয়ে দেখি, অপূর্ব দৃশ্য! ছাগলটার খালি হাড় ক'খানাই পড়ে আছে, আর তার পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন আমাদের বাঘা মক্কেল! গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন!

"ইস্, কী ঘুম! রাস্তার কোনো পাহারাওয়ালা কি পরীক্ষার্থী কোনো ছাত্রকেও এমন ঘুম ঘুমুতে আমি দেখি নি!

"বাঘটার আমি গায়ে হাত দিলাম, লেজ ধরে টানলাম একবার। একেবারে নিঃসাড়! থাবার নখগুলো গুণলাম, কোনো সাড়া নেই। তার গোঁফ চুম্‌ড়ে দিলাম, পিঠে হাত বুলোলাম—পেটে খোঁচা মারলাম—তবুও কোনো উচ্চবাচ্য নেই!

"অবশেষে সাহস করে তার গাল টিপলাম। আদর করলাম একটু। কিন্তু তার গালে আমার টিপসই দিতেও বাঘটা নড়লো না একটুও!

"আরো একটু আদর দেখাবো কিনা ভাবছি। আদরের আরো এক ধাপ এগুবো মনে করছি, এমন সময়ে বাঘটা একটা হাই তুললো।

"তার পরে চোখ খুললো আস্তে আস্তে।

"হাই তুলতেই আমি একটা হাই জাম্প দিয়েছিলাম—পাঁচ হাত পিছনে। চোখ খুলতেই আমি ভোঁ দৌড়! অনেক দূরে গিয়ে ফিরে দেখি বাঘটা উঠে আলস্যি ছাড়ছে—আড় মোড়া ভাঙছে; গা-হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছে একটু। ডন্-বৈঠক হয়তো সেটা, বা ওই রকমের কিছু একটা হতে পারে। কী যে—তা শুধু ব্যায়ামবীরেরাই বলতে পারেন।

তার পর ডন্-বৈঠক ভেঁজে বাঘটা চারধারে তাকালো। তখন আমি বহুৎ দূর গিয়ে পড়েছি, কিন্তু গেলে কি হবে, বাঘটা আমার তাক্

পেলো ঠিক। আর আমিও তাকিয়ে দেখলাম তার চাউনি! অত দূর থেকেও সেই দৃষ্টি—সে কটাক্ষ ভুলবার নয়!

"বাঘটা গুড়ি মেরে এগুতে লাগলো—আমার দিকে। আমরো দৌড় বেড়ে গেল আরো—আরোও।

"গুড়ি গুড়ির থেকে ক্রমে তুড়ি লাফ দেখা দিল বাঘটার।

"আর আমি? প্রতি মুহূর্তেই তখন হাতুড়ির ঘা টের পাচ্ছি আমার বুকে।

"বাঘটাও আসছে—আমিও ছুটছি বাঁচবার আশায়। ছুটছি প্রাণপণ ·····" বলতে বলতে আমি থামলাম—দম নিতেই থামলাম একটু।

"তার পর?···তার পর?···তার পর?" আড্ডার চারজনার ত্র্যহস্পপ্রশ্ন। বাঘের সম্মুখে পড়ে বিকল অবস্থায় এদিকে আমি যাই যাই, কিন্তু তাঁদের মার্জনা নেই। তাঁরা দম দিতে ছাড়ছেন না।

"·· ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছি এক খাদের সামনে—গভীর অতল খাদ। তার মধ্যে পড়লে আর রক্ষে নেই—সাত তলার ছাদ থেকে পড়লে যা হয় তাই—একদম্ ছাতু। পিছনে বাঘ, সামনে খাদ—কোথায় পালাই? কোন্‌দিকে যাই?

"দারুণ সমস্যা! এ ধারে খাদ, ওধারে বাঘ—ওধারে আমি খাদ্য আর এধারে আমি বব্‌বাদ্!

"কি করি? কী করি? কী যে করি?

"ভাবতে ভাবতে বাঘটা আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়লো।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ।" বলে আমি হাঁফ ছাড়লাম। এতখানি ছুটোছুটির পর কাহিল হয়ে পড়েছিলাম।

"তার পর? তার পর কী হোলো?"

"কী আবার হবে? যা হবার তাই হোলো।" আমি বল্লাম: "এ

রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে।”···আমার গপ্‌পো শেষ হোলো সেইখানেই।

“কী করলো বাঘটা?” তবু তাঁরা নাছোড়বান্দা।

“বাঘটা?” আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম: “কী আর করবে? বাঘটা আমায় গিলে ফেল্‌লো গপ্‌ করে।”

ব্যাঙ্ক লুট

বিছানায় বসে সকালের চায়ের পেয়ালা সবে মুখে তুলছি, রাজেন এলো লাফাতে লাফাতে। একটা চিরকুট হাতে করে।

"আজ রাত্তিরে আমাদের ব্যাঙ্ক লুট হবে! হাঁফাতে হাঁফাতে সে বল্লে।

পেয়ালার চা চল্‌কে উঠলো, চাদরের ওপর পড়ে গেল খানিক, —কিন্তু আমি বিচলিত হলাম না।

এই বার্তা ওর আরেক বার্তালা বলে মনে হোলো আমার। রোজ রোজ নতুন নতুন গুজব নিয়ে আসা কাজ রাজেনের। ও ছিল রাজা ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী, আর আমি ছিলাম সেখানকার এক কেরাণী। কাজটা ওই জুটিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

আফিস যাবার পথে, আমার কপাল, রোজই ওর বকুনি শুনতে হোতো আমায়। এমনও হয়েছে, ওর নাম ভুলে গিয়ে, রাজেন না বলে গজেন বলে ডেকে বসেছি ওকে—ওর গজগজানির চোটে।

প্রতিদিন ওর গজালি শুনে শুনে কান রপ্ত ছিল আমার। সেই সব রপ্তানির পর ফের এই আরেক নতুন আমদানি—এই আমার ধারণা হোলো।

"জানি আমি।" আমি বল্লাম: "আজকের কাগজেই পড়লাম তো। লুঠের বিশদ বর্ণনা প্রকাশ করেছে। একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ।"

"যাও, বোকার মতো বাজে বোকো না। খবর-কাগজে পড়বে কাল। কালকের কাগজে বেরুবে সব। আর তার সমস্ত খবর আছে এই—"

এই বলে সে তার হাতের চিরকুটখানা নাড়তে লাগলো—"এই আমার হাতের কাগজে।"

আমি চিরকুটের দিকে ভিরকুটি করলাম।

"আসছিলাম আমি তোমার বাসায়," তার-স্বরে বলতে লাগলো সে: "এই কাগজের টুকরোটা উড়তে উড়তে এসে পড়লো আমার মুখের ওপর। কোথ্‌থেকে এলো কে জানে! আমি মুখ থেকে সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছি, দেখি, কী যেন লেখা, আমার চোখে পড়লো হঠাৎ। তারপর—পড়েই ছাখো না, পড়লেই টের পাবে সব।"

পড়ে দেখলাম। কাগজটার এক কোণে পেন্‌সিলের আচড়ে লেখা:

"রাজা ব্যাঙ্ক ৩-৩০, দলের সবাইকে বলো।"

"বুঝলে এবার? ··" রাজেনের ধারাবাহিক বিবৃতি শুরু হোলো আবার: "দলের যে সর্দার সেই এই চিরকুট পাঠিয়েছে তার সাক্‌রেদের কাছে—দলের সবাইকে খবরটা দেবার জন্যে। খুব সম্ভব সাক্‌রেদটা দোতালা বাসে বসে হাওয়া খাচ্ছিল—মনে হয়, যাচ্ছিল দলের লোকদের আড্ডায় এটা জানাতেই—এমন সময়ে কি করে তার হাত ফস্‌কে—হাওয়ার চোটেই হবে হয়ত—বাসের দোতালায় কিরকমের জোরালো হাওয়া জানো তো?—কাগজখানা উড়তে উড়তে আমার মুখের ওপর এসে পড়ে—আর আমার নাকে লেগে আটকে যায়···"

"তার পরের খবর আমার জানা।—তোমাকে আর বিস্তৃত করে বলতে হবে না।" আমি জানালাম।

"তোমার জানা? ছাই জানা তোমার।" রাজেন যেন লাফিয়ে ওঠে: "কচু জানো তুমি। তারপরের খবর হচ্ছে, এই চিরকুট নিয়ে আপিসে গিয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে আমি দেখাচ্ছি। তিনি পুলিশে খবর দিচ্ছেন। পুলিশ এসে যথাসময়ে লুঠেরাদের হাতেনাতে পাকড়াচ্ছে। দুর্দান্ত দস্যুদের ধরিয়ে দেবার জন্যে সরকার থেকে আমি মোটা রকমের পুরস্কার মারছি।

আর সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কে আমার প্রমোশন হচ্ছে। চাই কি, এইজন্যেই হয়ত আমি সাব্-অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের কাজটা পেয়ে যেতে পারি। সাতশো টাকা মাইনের চাকরিটা।"

"খুব ডিটেকটিভ বই পড়ছো বুঝি আজ কাল?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ডিটেকটিভ বই পড়ার সঙ্গে এর কী?" রাজেন আমার প্রশ্নের পাশ কাটায়—"এ ছাড়া এই চিরকুটের আর কী মানে হতে পারে বলো তুমি?"

কী মানে হতে পারে? মনে মনে ভাবি খানিক। কিন্তু শক্ত শক্ত কথার মানে কোনদিনই আমার মগজে আসে না। আমি মাথা চুলকাই। অভিধানেও যে এর মানে মিলবে তা আমার বোধ হয় না। মাথা চুলকে আমি বলি—"লুঠের কথা এই চিরকুটের কোথায় আছে বলো তো? একটু বুদ্ধি খেলালেই বুঝতে পারতে, জনকতক লোক সখ করে এমনি আমাদের ব্যাঙ্কে এসে মিলতে চাইছে—এই তো!"

"তিনটে ত্রিশে? আজ শনিবার না? ব্যাঙ্ক বন্ধ না তখন? তখন বুঝি ব্যাঙ্ক খোলা থাকে বাইরের লোকের জন্যে? আর, কোনো ব্যাঙ্ক কিছু পার্ক নয় জনসাধারণের মিলন-স্থান হতে যাবে?"

"তাহলে তারা ব্যাঙ্কের বাইরেই এসে মিশবে।" আমি বলি।—"এ ছাড়া আর কী?"

"ব্যাঙ্কের বাইরে মিশবে? কিন্তু কেন শুনিতো? তার কারণ কী তা আমি জানতে পারি? শনিবারের বাজার আজ! আপিস দপ্তর বন্ধ সব তখন। ক্লাইভ স্ট্রীটের তিন সীমানায়ও কোনো সিনেমা হাউস নেই যে তারা বায়স্কোপ দেখার জন্যে জুটবে। তা ছাড়া, থাকলেও, তিনটে ত্রিশে—ম্যাটিনি শো সুরু হয়ে গেছে তখন। আমাদের ব্যাঙ্কের সামনে কোনো বাস্ ষ্টপ্ নেই যে বাসের জন্যে এসে দাঁড়াবে। অবশ্যি এটা খুব দুঃখের বিষয় যে ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়ে এখনো কোনো বাস যায় না…" নেতাজী সুভাষ রোড নাম হবার পরেও…

ওর কথাগুলো আমার কানে লাগে—প্রাণেও লাগে। বিশেষ করে আমাদের রাস্তায় বাস না যাবার কথাটা।

"……তারপর দল। দলের কথা কেন হে? দলের সবাইকে বলো—এ কেমন কথা? খবরের কাগজে দলাদলির কথা থাকে আমি মানি। তা নিয়ে আমি কিছু মনে করি না। কিন্তু এই সামান্য একটা চিরকুটে দলের কথা থাকলেই সন্দেহ জাগে। মনে হয় মিলন-স্থান ওদের ব্যাঙ্কই বটে কিন্তু মিলন-লগ্নটা বিকেলে নয়, রাত্তিরে—কৃষ্ণপক্ষের তিনটে ত্রিশে। আর, রাতের শেষ পহরে কী ধরণের ওস্তাদরা ব্যাঙ্কের কাছে এসে মিলতে চায়, ভেবে ছাখো একবার!'

আমি ভেবে দেখি। ইদানীং এ তল্লাটে ছোটখাট রাহাজানি হচ্ছিল বটে, কিন্তু তাই বলে রাজা ব্যাঙ্কের হানি হবে তা কিছু ভাবা যায় না। ব্যাঙ্ক-মারা কি এতই সোজা? আর আজ রাত্তিরেই যে কেন ঐ কাণ্ড ঘটবে তা ভাবতে পারি না। কাল কিংবা পরশু রাত্তিরেও তো হতে পারে। তিনটে ত্রিশ কিছু আজকের রাতেরই একচেটে নয়। কথাটা বলি রাজেনকে। রাজা ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি, কিন্তু আসলে একটি খাজা হলেও বলি।

"হ্যাঁ, ওটা একটা কথা বটে।" তবু সে আমার কথাটা মানে: "কিন্তু বাপু, ব্যাঙ্ক লুটের মত কাজ হঠাৎ কিছু ঝপ্ করে হয় না। অনেক দিন ধরে ফন্দীর পর অনেক প্ল্যান এঁটে, আট ঘাট বেঁধে তবে সমস্ত ঠিক করা হয়। এসব করে দলের পাণ্ডা। তারপর সব কিছু ঠিক-ঠাক হয়ে গেলে তখন জানানো হয় দলের লোকদের—একেবারে শেষ মুহূর্তে। কেননা আগে থেকে জানালে তারা গল্পগুজবে বাইরের লোকের কাছে বেফাঁস করে বসতে পারে। তার থেকেই আমার ধারণা…"

কিন্তু তখনো আমার বিশ্বাস হয় না। এমন কি, এও আমার মনে হয়, ঐ চিরকুট, আর পেনসিলের লেখা উক্ত কাহিনী ও বানিয়ে এনেছে—আজ সকালে আমার কাছে ফলাও করে বলার জন্যেই!

কিন্তু আপিসে গিয়ে ধারণা আমার টলে গেল। খবর পেলাম

প্রচুর টাকা এসে পড়েছে ব্যাঙ্কে, অন্যান্য ব্যাঙ্কে পাচার হবার অপেক্ষায়। এবং সোমবারের আগে সে-টাকা স্থানান্তরিত হবাব না।

যাও বা সন্দেহ ছিল আমার, এই যোগাযোগ দেখে দূব হোলো। দুয়ে দুয়ে যোগ করে যেমন চার মেলে তেমনিই যেন রাজেনের সমাচার মিলে গেল। রাজা ব্যাঙ্কে, আমি নই, আরেকজনকে রাজা হতে দেখলে স্বভাবতই ভালো লাগবার কথা নয়, তাহলেও রাজেনকে মুক্তকণ্ঠে আমার অভিনন্দন জানালাম।

লজ্জিত হয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে এলাম। চলে এলাম —আমার নিজের টেবিলে। চড় খেয়ে ফিরে এসে নিজের সামান্য চরকায় মন দিলাম।

কাজ করতে করতে আমার মাথা ঘামে। পুলিশ এসে ডাকাতদের কেমন করে পাকড়াবে সেই কথাই ভাবি। ব্যাঙ্কের মালখানায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে নাকি? যেই না ওরা সিঁধ কেটে, কিংবা দরজার তালা ভেঙে সেঁধুবে অমনি গিয়ে খপ্ করে একেবারে যাকে বলে হাতে নাতে গেরেপ্তার? অথবা, হয়তো তারা ব্যাঙ্কের বাইরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ওৎ পেতে থাকবে। লোকগুলো এসে লুঠ করে নিয়ে যাবার পর তাদের পিছু পিছু ফলো করে আড্ডায় গিয়ে হানা দেবে। বামাল সমেত সবাইকে সামলাবে···এক সঙ্গে? যাকে সংস্কৃত করে বলা চলে, ফলোয়েন পরিচিয়তে।

ভাবতে ভাবতে আমার যেন কী হয়! তারপর থেকে যাকেই দেখি তাকেই আমার সন্দেহ লাগে। যারাই চেক ভাঙাতে কি টাকা জমা দিতে আসে আমার মনে হয়, এক একটি ব্যাঙ্কমারু! কারো হাবভাব চালচলন সুবিধের নয়!

আর চেহারাগুলোও যেন কেমন সব! ঠিক চোর ডাকাতদের যেমন হয়ে থাকে। লুঠেরাদের চরই যে চোরাগোপ্তা চারিদিকে ঘুরছে

—আসছে যাচ্ছে—ব্যাঙ্কের অন্ধিসন্ধির খবর নেবার তালে রয়েছে, এই আমায় মনে হয় খালি।

টিফিনের সময় পাঁউরুটিতে কামড় দেবার ফাঁকে পাশের একজনের খবরের কাগজে আমার নজর পড়লো কাগজের এক জায়গায় কালি দিয়ে দাগ মারা একটা কথা--রাজা ব্যাঙ্কঃ ৩-৩০! চৌকো চৌহদ্দির মধ্যে চৌকস খবরটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে ছাপার অক্ষরে। চোখে পড়লো আমার।

কাগজের সেটা ঘোড়ার পাতা—যেখানে শনিবারে ঘোড়দৌড়-খেলার খবর থাকে। রাজা ব্যাঙ্ক নামক ঘোড়াটা সেদিন সাড়ে তিনটেয় দৌড়চ্ছে।

"রাজা ব্যাঙ্কের জানো নাকি কিছু?" জিজ্ঞেস করলাম লোকটাকে। —"খবর রাখো কোনো?"

"ওটা বাজি মারবার ঘোড়া। হট্‌ ফেভারিট্‌, নির্ঘাৎ জিতবে আজ।"

কাগজের কোণটা ছিঁড়ে নিয়ে ছুটলাম রাজেনের খোঁজে।—"ওহে, শোনো শোনো। তুমি কি ম্যানেজারকে বলেছো নাকি কথাটা?"

"না, বলিনি এখনো। এইবার বলব। তাঁর লাঞ্চ শেষ হোক আগে।"

"তাহলে আর বোলো না। এই ছাখো।"—আমার হাতের টুকরোটা ওকে দিলামঃ "বেঁচে গেছো খুব। আর একটু হলেই সকলের উপহাসের পাত্র হতে। ঠাট্টা করতো সবাই তোমায়। এমন কি, পুলিসরাও।"

বলেই আমি ভ্রম সংশোধন করিঃ "উঁহু, পুলিশে ঠাট্টা করে না। ঠাট্টা করার পাত্র নয় তারা। ডাকাত ধরতে এসে না পেলে উলটে তোমাকেই পাকড়ে নিয়ে গাঁট্টা মারতো থানায়!"

রাজেনের চোয়াল ঝুলে পড়ে। ওর সাতশো টাকার সাবঅ্যাসিস্-

ট্যাণ্ট ম্যানেজার হবার স্বপ্ন ঘোড়ার খুরের চোটে উড়ে যায় কোথায়! একমুহূর্তেই।

ওকে মুষড়ে পড়তে দেখে আমি ওকে উস্‌কে দিতে লাগি—"মনমরা হোয়ো না, ছি! এর জন্য আমি কিছু মনে করিনি। অশ্বরাজ আর রাজা ব্যাঙ্কে তালগোল পাকিয়ে বসেছো—তা, অমন হয়েই থাকে। অনেকেই অমন করে! হাতের পাঁচটা আঙুল কখনো সমান হয় না। সবার মাথা কিছু সমান নয়।"

আস্তে আস্তে ঘাড তোলে সে—"যাক্‌, আজ আমি ঐ ঘোড়াই ধরবো তাহলে। মাঠেই যাবো আজ। ঘোড়ার খবরটা যখন আপনার থেকে ভেসে এসে আমার কপালে লেগেছে—"

"কপালে নয়, নাকে।" আমি শুধ্‌রে দি।

"একই কথা। কপাল থেকেই নাক। তখন যা থাকে কপালে।" আবার ওর মুখে হাসি ফোটে।

"হ্যাঁ, যদি কপালে লাগে, তাহলে সাতশো টাকার মাইনে কী, তুমি নিজেই একটা টাঁকশাল বনতে পাবো। মনে করো, যদি বাজি জিতে হাজার দশেক টাকা পাও, তুমি একটা ছোটখাট কারখানা খুলতে পারো। পারো না কি? আর এই আক্রার বাজারে একখানা কারখানা হাঁকড়াতে পারলেই তো তুমি রাজা!" হাত পা নেড়ে আমি বাৎলাই: "আর তখন তুমি নিজেই একটা ব্যাঙ্ক। রাজেন ব্যাঙ্ক।"

এই বলে, আমি ওর কল্পনানেত্র উন্মীলিত করতে যাই: "তোমার আজকের ঐ মাঠের কাণ্ড। আর ঐ কাণ্ড থেকেই তোমার কারখানা। আর তার পরেই তোমার কাণ্ড কারখানা।" কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে জগাই-মাধাইয়ের মতন—মাণিকজোড়।

সে-মাসের সমস্ত মাইনেটা রাজেন সেদিনের তিনটে ত্রিশে রাজা ব্যাঙ্কের ওপর লাগালো। কিন্তু ঘোড়াটা আশামত আগালো না। এলো সকলের শেষে। রেসের মাঠে হার হোলো রাজেনের। তারপর

থেকে রাজেন আর আমার সঙ্গে কথা কয়নি। আজ পর্যন্ত না। কথা না বার্তা না—বার্তালা তো নয়ই। রাজেনের রাজত্ব থেকে আমার প্রজাত্ব গেছে। তার কারণ? তার কারণ, তার রেসের হার নয়,—সেই ডিগবাজি না, মাঠের সেই হয়রাণি (বা হয়-running) নয়, তার কারণ হচ্ছে…মাঠময় সেই হরির লুঠের পর আরেক হরিবল লুঠ হোলো। সেই রাত্রিরেই। সেও প্রায় সাড়ে তিনটেই হবে রাত—আঁচ পাওয়া গেল যদ্দূর। উক্ত চিরকুটের লিখিতমত, কাঁটায় কাঁটায়, রাজাব্যাংক ভেঙে লুঠ করে নিয়ে গেল ডাকাতরা।

অশ্বমেধ কথা

ভালো আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে। পঞ্চানন কী করবে কিছুই স্থির করতে পাবে না। কলিযুগ হয়ে অবধি অশ্বমেধের রেওয়াজ নেই, তা নইলে হয়ত সে একটা অশ্বমেধ-যজ্ঞই করে বসত। কথা বার্তা নেই, একটা কৃষ্ণের জীবকে ত অধর্ম করে মারা যায় না অমনি। তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে সুবিধা পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে—মা কালীর কাছে অশ্ববলি দেওয়া যায় কিনা তার বিধান ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করবে।

মনে মনে সে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়—অশ্ব তো পশুর মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কি? পাঁঠার চারটে পা, ঘোড়ারও তাই,—সবদিকেই মিল আছে, যা কিছু তফাৎ তা কেবল ল্যাজের আর আওয়াজের। তা শাস্ত্রেই যখন রয়েছে মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, তখন—পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দদ্যাতের বিধানও কি আর শাস্ত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে।

এককালে ঘোড়াটা অবশ্যি খুবই কাজ দিয়েছিল, কিন্তু বুড়ো হয়ে অব্দি আজকাল কোনো কাজে লাগা দূরে থাক, তার পেছনে লেগে থাকাই একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারি পেটুক হয়েছে ঘোড়াটা। জামার হাতা, নতুন ছাতা, খবরের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্তর, দরকারী চিঠি, কখন কী খায় স্থির নেই। সেদিন তো কাশ্মিরী শালের আধখানাই সাবড়ে দিলো। তাছাড়া রান্নাঘরের দিকেও নজর আছে বেশ।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুরমত প্রতিযোগিতা। রান্নাঘর

থেকে ছ্যাঁক্‌ছোঁক্ আওয়াজ কিম্বা বেগুণভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায়? পাড়াগাঁয়ের মেটে বাড়ী পঞ্চাননের—ধানের গোলা-গুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর—মুহূর্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নীর কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুনভাজা না দিয়ে? বেগুনভাজার প্রতি পঞ্চাননেরো দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটোর জন্যেই—পেটভরে বেগুন-ভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নী বেগুন না ভেজে, ঘোড়াটাকে ঠকাবার মৎলবেই, বেসন দিয়ে বেগুনী ভাজছিলেন। গন্ধ পেয়েই ঘোড়াটা সেইখানে হাজির। দু-একবার সে গিন্নীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—চিঁহি চিঁহি।

সংস্কৃত ভাষার তার মানে হচ্ছে—দেহি দেহি।

কিন্তু গিন্নী কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নীকে পাত করে ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুনী আত্মসাৎ করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে সুরু করে দিয়েছে। সেদিন থেকে ঘোড়াটার প্রতি পঞ্চাননের আর চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে সে—ভাটাপাড়া যাবেই।

গিন্নীকে সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে অমন করে আস্কারা দাও, তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন। সত্যি বলছি, একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। ওকে খুন করে যদি ফাঁসি যেতে হয় সেওভি আচ্ছা।

ঘোড়াটা কিন্তু গ্রাহ্য করে না পঞ্চাননকে। সুবোধ বালকের মত সব খায়।

তারপরের দিনই সে কলকাতা থেকে সদ্য-আনানো পঞ্চাননের টর্চ-বাতিটা মুখের মধ্যে পুরেছিল, কিন্তু ভালো করে চিবিয়ে যখন টের পেল যে ওটা ঠিক বেগুনী নয় তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চ লাইটটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন ত রেগে টং! সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল—হতভাগা, তোর কি একটুও বুদ্ধি নেই? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি!

সত্যি, টর্চ লাইটের এমন টচার ভাবাও যায় না। ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে—চিঁ হি হি! অর্থাৎ—যা বলো তুমি!

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে, এই হঠকারিতার জন্যে কী সাজা ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোট ছেলে বটকৃষ্ণ এসে পরামর্শ দিল,—বাবা, ওর লেজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না। ঘুমোতে পাবে না। জব্দ হবে খুব।

পঞ্চানন কাঁচি নিয়ে উদ্যোগ-আয়োজন করছে—মেয়ে রাধারাণী ছুটে এসে বলল, বাবা করছো কি! মশার কামড়ে তাহলে ও আমাদের মশারীর মধ্যে এসে ঢুকবে যে!

বাধ্য হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে, হ্যাঁ, সে একটা ভাবনার কথা বটে। ঘোড়াটার যেরকম বুদ্ধি-শুদ্ধি আর যেরূপ কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, তাতে ওর পক্ষে সবই সম্ভব। মশারীর মধ্যে ঢোকা কি, ওদের পাশে শুয়ে পড়াও কিছু কঠিন না ওর পক্ষে।—সটাং চিৎ পটাং।

এমনই সমস্যার মুহূর্তে জ্যোতিষ বোস এসে উপস্থিত।

"কিহে পঞ্চানন, কী হচ্ছে? হাতে কাঁচি কেন?"

"এস ভাই, এই ট্রেন্ করছি ঘোড়াটকে।"

"তুমি হর্স-ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে হে?"

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বলে—আর ভাই, শিক্ষা না দিলে নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।

"তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুলে গেছ। আমাদের পাড়াই মাড়াও না আর। দুবছর থেকে দেখা নেই—ব্যাপার কি?'

পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়ল—কিসের দেনা?

"সেই যে একদিন বাজারে নিলে। বছর দুই আগে।"

"হাঁ, হ্যা, মনে পড়েছে, চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলুম বটে। মনে ছিল না ভাই।"

জ্যোতিষ বোস্ ছেলেবেলা থেকেই বেশ হিসেবী, একথা পঞ্চানন জানত। কিন্তু বুড়োবয়সে সে যে এতবেশি হিসেবী হয়ে উঠবে যে চার আনা পয়সার কথা দু বছর ধরে মনে করে রেখে ভিন্ গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে তাই চাইতে আসবে, পঞ্চানন তা ভাবতে পারেনি। বাবা পাঁচশো টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারতি কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে—কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন বেশ অবাক হোলো।

"তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হোলো তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসাব লেখা আছে, নিজে গিয়ে দেখতে পারো একদিন। এইবার একটু গা করে ওটা দিয়ে দাও।"

"কী যে বলো তুমি! সামান্য চার আনা পয়সার জন্য আমি অস্বীকার করব? তা তুমি কষ্ট করে এতদূর এসে আমাকে লজ্জা দিলে! রাধু, তোর মার কাছ থেকে চার আনা পয়সা চেয়ে আন তো। আর বল গে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুনী ভাজতে। বেগুনী দিয়ে আচারের তেল মেখে মুড়ি খেতে বেশ হে! তার সঙ্গে কাঁচা-লঙ্কা!"

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বলল—সে হবেখন। খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না। কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই ভাই।"

কিছু বুঝতে না পেরে পঞ্চানন বলল—চার আনা নেই কি রকম? তার মানে?

"আহা, বুঝতে পারছ না! সুদে আসলে তা পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা পাবে কোথায়! তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও নাহয় আমায়।"

য়্যাঁ? পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই! পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে

শক্ত নিশ্চয়ই—কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমন কি সহজ তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবী, একথা তার অজানা নয়, কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়েসের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে তা কে জানত? না, জব্দ করতে হবে ওকে।

কাষ্ঠহাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়— তা নেবেই না হয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো আর জলে পড়বে না। বোসো, জিরোও, গল্প করো। অনেকদিন পরে দেখা।

"হ্যাঁ, বসব বই কি! বেগুনীও খাব। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ না—কিন্তু কচি শশা আছে তো?"

পঞ্চানন মনে মনে মৎলব এঁটে বলে—এতটা রোদে তিন কোশ দূর থেকে হেঁটে এসছে, এই বয়সে এতটা পরিশ্রম কি ভালো তোমার পক্ষে? একটা ঘোড়া রাখো না কেন হে? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না, তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও বটে! দেখছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।

জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে কটাক্ষপাত করে জবাব দেয়—বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেকদিন থেকে ভাবছি কথাটা। সত্যিই, এ বয়সে আর হাঁটা-চলা পোষায় না! কিন্তু মনের মত ঘোড়া পাই কোথায়?

"কিরকম মনের মত শুনি?"

"এই ধরো খুব তেজী হবে না, আস্তে আস্তে হাঁটবে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই, তাহলে কি হাড় গোড় আর আস্ত থাকবে?"

"তা সেরকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায়? কিনে শিখিয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটাই কি কম তেজী ছিল, অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চাপো, তাহলে ও হাঁটছে

বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত, এত বিনয়ী, এরূপ নম্রস্বভাব—মানে, সুশিক্ষার যা কিছু সদ্‌গুণ, সব আছে এই ঘোড়াটার।"

"তা ভাই, তোমার ঘোড়াটির মত অমন উচ্চশিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায়? আমি ত আর তোমার মত ট্রেনার নই। তোমার ঘোড়াটি কতয় কিনেছিলে?"

"দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মাত্তর পনের টাকায়।"

"তা তুমি এক কাজ কর না, পঞ্চানন। পনেরো টাকায় ঘোড়াটা আমায় দাও। তোমার এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই ধরো, একটা দশ টাকার নোট।"

"না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে।"

"আবার নতুন ঘোড়া সস্তায় কিনে শিখিয়ে নিতে পারবে—তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে!"

পঞ্চানন তবুও তেমন গা করে না। ঘোড়ার আজকাল চড়া দাম।

'ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশি লাভ নাই করলে। এই নোটখানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয়ে গেল—তা নইলে ভেবে ছাখো, পৌনে তিন পাই যোগার করা তোমার পক্ষে খুব শক্ত হত নাকি?"

পঞ্চানন হাসি চেপে আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—তা তুমি যখন এত করে বল্‌ছো। ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম নাহয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।

"ভালোই হোলো। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলুম পথে ত তোমার বাড়ী পড়বে, দেখা করে নিয়ে যাই টাকাটা। তা ভালোই করেছি। মাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভালো দেখাতো হে?"

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা দিলেন। সত্যি, এমন শিক্ষিত আর শান্ত ঘোড়া দেখা যায় না প্রায়। পঞ্চানন যা বলেছিল, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। হাঁটছে বলে মনেই হয় না। অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুসী। নিঃশ্বাস ফেলে বলে—বাঁচা গেল এতদিনে। আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে থোক্ লাভ নগদ। অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলুম, তা জ্যোতিষ বোসকে দেওয়াও যা, অশ্বমেধ করাও তা। নইলে পৌণে তিন পাই জোগাড় করা খুব শক্ত হোতো আমার।

কেবল গিন্নী একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন—খেতে পেত না বেচারা, তাই অমন ছোঁ ছোঁ করত! ঘোড়ায় দানা খায়, ছোলা খায়, কত কী খায়—সেসব ও চোখেও দেখেনি কখনও। টচ খাবে বেগুণী খেতে চাইবে তা ওর দোষ কি! কথায় বলে পেটের জ্বালায় মানুষ ঘাস খায়!

পঞ্চানন বলল—তাহলে ঘোড়াটার ভাগ্য বলতে হবে। জ্যোতিষরা বড়লোক, সুখে থাকবে ওদের বাড়ী। আমরা গরীব মানুষ, নিজেদেরই দানা পাইনে, কোথায় পাব ঘোড়ার দানা!

হেঁটে গেলে যতক্ষণে থানায় পৌঁছানো যেত, তার পাঁচ গুণ সময় লাগলো জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চড়ে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারি খুসী। এতখানি রাস্তা তিনি অশ্বারোহণে এসেছেন, কিন্তু একবারও পড়ে যাননি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু বেগ পেতে হয়েছে। ওঠার সময় টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিলেন। কিন্তু নামবার সময় তিনি অনেক চেষ্টা করলেন যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আর তাঁর পক্ষে নামাটা সহজ হয়, কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাৎ হোলো না পর্যন্ত। তাঁর আশা ছিল শিক্ষিত ঘোড়া আর কিছু না হোক অন্ততঃ নম্র হতে শিখেছে। নিশ্চয় তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝল তাঁর ইঙ্গিত, না দিল কান তাঁর সাধ্য সাধনায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই লাফিয়ে নামতে হোলো, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর হাড়গোড় ভাঙেনি —একটুও তিনি জখম্ হন নি। চড়াই উৎরাই দুই তাঁর নির্বিঘ্নে হয়েছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই খাতির

ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুকতেই তিনি হ্যালো মিষ্টার বোস্ বলে তাকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে গিয়ে খানা পাঠিয়ে দেবার হুকুম হোলো আর্দালির ওপর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর জ্যোতিষ বোস আলাপ করছেন এমন সময়ে আস্তাবল থেকে বিরাট এক আওয়াজ এল—চ্যা হ্যাঁঃ হ্যাঃ হ্যাঁঃ হ্যাঃ!

কী ব্যাপার? ম্যাজিস্ট্রেট এবং জ্যোতিষ দুজনেই চম্‌কে উঠলেন। ঘোড়ার আওয়াজ বটে, কিন্তু এ রকম আওয়াজ তাঁরা জীবনে কখনও শোনেনি। কোনো ঘোড়ার মুখ থেকে নয়। এমন কি, যে ডার্বি জিতেছে, সেও এহেন উচ্চনিনাদ করে না। দুজনেই আস্তাবলের দিকে ছুটলেন। সেখানে তখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আর ঘোড়াটা কেবলই করছে—চ্যা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যা!

ঘোড়ার সামনে দুবাল্‌তি ভরে ছোলা আর দানা সাজানো রয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা তো স্পর্শও করেনি। সে বোধহয় তার এতখানি সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছে না। সে একবার করে বালতির দিকে তাকাচ্ছে আর তার ভেতর থেকে অট্টহাস্য ঠেলে উঠছে—চ্যা হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি করে ওর অট্টহাস্য থামানো যায় সবাই সেই ভাবনায় পড়ল। ঘোড়ার হাসি—তা থামানো কি সহজ ব্যাপার? কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হোলো না কাউকেই।

হাসতে হাসতে মারা গেল ঘোড়াটা।

হাতীর বাতিক

কাকার হোলো হাতীর বাতিক শেষটায়।

সংগ্রহ করার 'হবি' আগে কখনো ছিল না আমার কাকার। কেবল এক টাকা ছাড়া। কিন্তু টাকা এমন জিনিস যে যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হলে অনেক গ্রহ আপনিই এসে জোটে। আর তখন থেকেই সংগ্রহ সুরু।

একদিন ওই গ্রহদের একজন কাকাকে বললে, দেখুন, সব বড় লোকেরই একটা না একটা কিছু সংগ্রহ করার ঝোঁক থাকে। তা না হলে আর বড়লোক কী? বড়লোক আর বড়লোকে তফাৎ কোথায়? টাকায় তো নেই। ওইখানেই তফাৎ। ওখানেই বিশেষ বড়লোকের বিশেষত্ব। আর বৈশিষ্ট্যই যদি না থাকলো তবে বড়লোক কিসের? তবে আর শিষ্টসমাজে থাকা কেন? আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জেরও কলেক্‌সনের হবি ছিল।

কাকা বিস্মিত হয়ে গ্রহের পানে তাকান- পঞ্চম জর্জও?

"নিশ্চয়। কেন, তিনি কি বড়লোক ছিলেন না? কেবল সম্রাটই নন, দারুণ বড়লোকও ছিলেন যে! অনেকগুলো জমিদারকেই এক সঙ্গে কিনতে পারতেন তিনি।"

"ও! তাই বুঝি তাঁর জমিদার সংগ্রহ করার বাতিক ছিল?" কাকা আরও অবাক হন।

"উঁহু। জমিদার নিয়ে রাখবেন তিনি কোথায়? ও তো চিড়িয়াখানায় রাখা যায় না। তিনি কেবল ষ্ট্যাম্প কলেক্ট করতেন—"

'ইস্‌ট্যাম্পো ? ওই যা পোষ্টাপিসে পাওয়া যায় ? না—দলিল—টলিলের ?"

"দলিলের নয় ! নানা দেশের নানারাজ্যের ডাকটিকিট, একশো বছর আগের, তার আগের, তারো আগের—তারো পরের—এম্‌নি নানন্‌ কালের, নানা আকারের, রঙ বেরঙের যতো ডাক টিকিট।"

"বাঃ, বেশত!" কাকা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন -"আমারও তা করতে ক্ষতি কি ?"

"কিছু না ! তবে এক একটা পুরোণো টিকিটের দাম আছে বেশ ! দু' পাচ টাকা থেকে সুরু করে দু পাচ দশ বিশ হাজার দু'লাখ চার লাখ পর্যন্ত।"

"য়্যাঁ, এমন ?" কাকা কিছুটা ভড়্‌কে যান : "তাহোক, তবুও করতেই হবে আমায়। টাকার ক্ষতি কি আবার একটা ক্ষতি নাকি ?"

"নিশ্চয় নয়। তবে আর বড়লোক বলেছে কেন ?" এই বলে গ্রহটি উপসংহার করে। এবং আমার কাকাকেও প্রায় সংহার করে আনে।

কাকা ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করছেন এ খবর রটতে বাকি থাকে না। পঞ্চাশখানা য়্যালবাম্‌ যখন প্রায় ভরিয়ে ফেলেছেন তখন একদিন সকালে উঠে ছাখেন বাড়ীর সামনে পাচশো ছেলে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কী ? জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় সবাই ওরা এসেছে কাকার কাছেই—কেউ ষ্ট্যাম্প বেচতে, কেউ বা কিনতে। সকলের হাতেই ষ্ট্যাম্পের য়্যালবাম্‌।

কাকা তখনই গ্রহকে ডেকে পাঠান, একি কাণ্ড ? এরাও সব ইস্‌ট্যাম্পো সংগ্রহ করছে যে ? আর করছে বলে করছে ! অনেক দিন ধরে করছে—আমার ঢের আগে থেকেই। এ কী ব্যাপার ?

কী হয়েছে তাতে ? গ্রহটি ভয়ে ভয়ে বলে, কাকার ভাবভঙ্গী তাকে ভীত করে তুলছে তখন—কেন, ওদের কি করতে নেই ?

সবাই যা করছে, পাড়ার পুঁচ্‌কে ছোঁড়াটা পর্যন্ত—কাকা ফেটে

পড়েন এবার, আমাকে তুমি লাগিয়েছ সেই কাজে? ছ্যা! কেন, কেন, এরাও কি সব বড়লোক?

তারপর তিনি আফসোস করতে থাকেন, ইস্‌ট্যাম্পের আমার দশ হাজার টাকা তুমি জলে দিলে!—ছ্যা!

গ্রহ আর কী জবাব দেবে, সে তখন বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। তিত-বিরক্ত কাকা নিজের যত য়্যালবাম্ খুলে ছিঁড়ে ছড়িয়ে চ্যাঙরাদের মধ্যে ষ্ট্যাম্পের হরিলুট লাগিয়ে ছান, সেই দণ্ডেই।

কিন্তু ষ্ট্যাম্প ছাড়লেও বাতিক তাঁকে ছাড়ল না। বাতিক জিনিষটা প্রায় বাতের মতই, একবার ধরলে ছাড়ানো দায়। তিতি বললেন, ইসট্যাম্পো টিসট্যাম্পো নয়—এমন জিনিস সংগ্রহ করতে হবে যা কেউ করে না, করতেও পারে না। সেইরকম কিছু থাকে তো ছাখো তোমরা।

তখন নবগ্রহ মিলে মাথা ঘামাতে সুরু করলো, তাদের প্রেরণায়, তাদেরই আরো নব্বই জন উপগ্রহের মাথাও ঘামতে লাগলো। নতুন হবিদের খুঁজে বের করতে হবে—রীতিমত বুদ্ধি খাটিয়ে।

নানারকমের প্রস্তাব হয়। খেচরের ভেতর থেকে প্রজাপতি, পাখীর পালক; জলচরের ভেতর থেকে রঙিন মাছ, তিমির হাড়, কচ্ছপের খোলা; ভূচরের ভেতর থেকে পুরোনো আসবাবপত্র, সেকেলে ঢালতলোয়ার, শিলালিপি, তাম্রলিপি, হাতপাভাঙা মূর্তি; নানাচরের মধ্যে চীনে বাসন, গরুর গলার ঘণ্টা, রঙ বেরঙের নুড়ি, রাজ্যের খ্যাল্‌না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাকা সমস্তই বাতিল করে ছান। সকলেই পারে সংগ্রহ করতে এসব।

তখন পকেটচরদের উল্লেখ হয়। নানাদেশের একালের সেকালের আসরফি মোহর টাকা পয়সা সিকি দুয়ানি প্রভৃতি। ফাউণ্টেনপেন দেশলায়ের বাক্সও পকেটচরের মধ্যে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু কাকাকে রাজি করানো যায় না কেউ না। কেউ করেছেই এসব, তাঁর জন্যে ফেলে রাখেনি নিশ্চয়।

কেউ কেউ মরীয়া হয়ে বলে—কেরোসিনের ক্যানাস্তারা, নস্যির ডিবে, জগঝম্প কিংবা গাঁজার কলকে অর্থাৎ চরাচরের কিছুই আর বাকি থাকে না।

তথাপি কাকার ঘাড় নড়ে।

নানারকমের খাবার দাবার চপ কাটলেট, সন্দেশ, শনপাপড়ি বিস্কুট চকোলেট, টফি লেবেনচুস্—মানে যত রকমের মুখচর আর মুখরোচক জিনিস হতে পারে নাম বলা হয় তবু কাকাকে লালায়িত করা যায় না।

অবশেষে চটেমটে একজনের মুখ থেকে ফোঁস বেরিয়ে যায় তবে আর কি, হাতী। আর কী করবেন—হাতীই সংগ্রহ করুন। শ্বেতহস্তী।

কিন্তু পরিহাস বলে একে গ্রহণ করতে পারেন না কাকা। তিনি বারম্বার ঘাড় নাড়েন,—শ্বেতহস্তী। সোনার পাথর বাটির মতো ও-কথাটাও আমার কানে এসেছে বটে। বর্মা মুলুকে না শ্যাম রাজ্যে কোথায় যেন পাওয়া যায়। তার পূজাও হয় বলে শুনেছি। হ্যাঁ. যদি হাতীই সংগ্রহ করতে হয় তবে সেই জিনিস। বড় লোকের আস্তাবলে দূরে থাক, বিলেতের চিড়িয়াখানাতেও এক আধটা আছে বিনা সন্দেহ। পঞ্চম জর্জও তাঁর য়্যাল্‌বামে রাখতে পারেননি! হ্যাঁ, ওই শ্বেতহস্তীই আমার চাই।

তক্ষুণি কাকার রোখ হয়, শ্বেতহস্তীই তাঁকে দিতে হবে এনে—শ্যামরাজ্য কি ব্রহ্মরাজ্য থেকে হোক, হাতীপোতা কি হস্তিনা থেকে হোক, জলপাইগুড়ি কি জব্বলপুর থেকে হোক, করাচী কি রাচী থেকে হোক, উনি সেসব জানেন না, কিন্তু শ্বেত হস্তী ওঁর চাই। চাইই, যেখান থেকে হোক যোগাড় করে দিতেই হবে, তা যত টাকা লাগে লাগুক। এক আধখানা হলে চলবে না, ডজনকে ডজন চাই, তা নইলে কলেক্‌সন আবার বলে কাকে!

এই বিবৃতি দিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ইঞ্জিনিয়ার কনট্রাক্টার ডাকিয়ে, আসন্ন শ্বেতহস্তীদের জন্যে বড়ো বড়ো আস্তাবল বানাবার হুকুম ছান।

আশ্চর্য! দু হপ্তার মধ্যে জনৈক শ্বেতহস্তীও এসে হাজির। নব গ্রহেরই এক উপগ্রহ কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছে।

খাসা শ্বেতহস্তী! চমৎকার! দেখতো সকলে আমরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকি।

কাকা তো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন—"বটে বটে। এই সেই শ্বেত হস্তী? বাঃ! দিব্যি ফরসা রঙ তো। বাঃ বাঃ!"

অনেকক্ষণ তাঁর মুখ থেকে বাহবা ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না। হাতীটাও তার সাদা শুঁড় নেড়ে কাকার কথার সমর্থন করে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "জানিস, বর্মায়,—না না, বর্মায় না, শ্যামরাজ্যে এ রকম একটা হাতী পেলে রাজারা লুফে নেয়। মাথায় করে রাখে। রাজার চেয়ে বেশী খাতির হাতির। মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পূজো হয় বাতিমতো—হুঁ হুঁ, শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে—রাজা নিজে পূজো করেন। রাজপূজো যাকে বলে! জানিস্?"

এমন সময়ে হাতীটা একটা ডাক ছাড়ে। যেন কাকার গবেষণায় সায় দিতে চায়—উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করে।

হাতীর ডাক যে কিরকম তা একমুখে বর্ণনা করা যায় না। সে ডাক ঘোড়ার চিঁহি কি গরুর হাম্বার মতো নয়, ঘোড়ার ডাকের দিশ ডবল, গোরুর অন্ততঃ পঞ্চাশগুণ একটা হাতীর আওয়াজ। বেড়ালের কি শেয়ালের ধ্বনি নয় যে সহজে এক মুখে ব্যক্ত করা যাবে।

হাতীর ডাক ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য নেই আমার।

ডাক শুনেই আমরা দু চার দশ হাত ছিটকে পড়ি। কাকাও পাঁচ গজ পিছিয়ে আসেন।

"বাঃ বাঃ! যেন মেঘ ডাকল।" কাকা বলেন, "সিংহের ডাক কখনো শুনিনি, তবে বাঘ কোথায় লাগে! হ্যাঁ, এমন না হলে একখানা ডাক! এ না হলে হাতী? একি তোমার ডাক টিকিট?"

উপগ্রহটি, যিনি হাতীর সমভিব্যহারে এসেছিলেন, এতক্ষণে একটি কথা বলার সুযোগ পান্—"প্রায়ই ডাকবে একরকম। শুনতে পাবেন। হর্দম ডাকবে—যখন তখন।"

প্রায়ই ডাকবে? রাত্রেও? তাহলে তো ঘুমোনোর দফা রফা—কাকা যেন একটু ভাবনায় পড়েন।

"উহু, রাত্রে ডাকে না। হাতীও ঘুমোয় তো। রাত্রে কেবল ওদের শুঁড় ডাকে।"

"তা ডাকে ডাকুক। ডাকুক গে শুঁড়। আমাদেরও কি নাক ডাকে না? কিন্তু কিরকম রংটা বল্‌তো।" আবার আমার দিকে তাকান কাকা—"যেন ধব্ ধব্ করছে। আর সব হাতী এর কাছে দাঁড়াতেই পারে না, তারা হাতী নয়—যতো জানোয়ার। আহেল বিলাতী সাহেবের কাছে যেন সাঁওতাল। এই ফর্সা রংটি এর বজায় রাখতে হলে সাবান্ মাখিয়ে একে চান্ করাতে হবে দুবেলা—ভালো বিলিতি সাবান, হুঁ হুঁ। পয়সার দিকে গ্রাহ্য করলে চল্‌বে না" আমার এমন সোনার হাতী কালো হয়ে যেতে কতক্ষণ?

"না, না, অমন কাজটি করিবেন না" উপগ্রহটি সবিনয়ে প্রতিবাদ করে···"আজ্ঞে, ঐটিই বারণ। স্নানটান এর একেবারে বন্ধ। শ্বেতহস্তীর গায়ে জল ছোঁয়ানোই নিষেধ, তাহলে গলগণ্ড হয়ে মারা যাবে।"

"য়্যাঁ, বলো কি?" কাকা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন,—"তাহলে, তাহলে?"

"ইতর হাতীর মতো নযতো যে রাতদিন জলে পড়ে থাকবে। শ্যামরাজ্যে রীতিমতো মন্দিরে লোহার সিংহাসনের ওপরে বসানো থাকে, সেখানে হর্দম ধূপ ধুনো পূজো আর আরতি চলে। কেবল চরণামৃত তৈরীর সময়েই যা এক আধ ফোঁটা জল ওর পায়ে ছোঁয়ানো হয়। এখানে তো সেরকম হবে না"

কাকা তার কথা শেষ করতে দ্যান না—"এখানে কি করে হবে? রাতারাতি মন্দিরই বা বানাচ্ছে কে, আর লোহার সিংহাসনই বা পাচ্ছ

কোথায় ? তবে পূজারী জোগাড় করা হয়তো কঠিন হবে না, পুরুৎ বামুনের তো আর অভাব নেই পাড়ায় কিন্তু হাতী পূজোর মন্ত্র কি তারা জানে ?"

কাকার প্রশ্নটা আমার প্রতিই যেন হয়। আমি জবাব দিই— হাতীর চন্নামৃত আমি কিন্তু খেতে পারব না কাকা।

গোড়াতে প্রতিবাদ করে রাখা ভালো। কথায় বলে সেফ্‌টিফাস্‌ট্‌। কথাটা কিন্তু সেফ্‌টি পিনের ন্যায় কাকার গায়ে লাগে—"পারবি না ? কেন পারবি না ? একি তোর গুজরাট হাতী—কালো আর ভূত ? এ হোলো গিয়ে ঐরাবতের বংশধর, স্বর্গের দেবতাদের স্বগোত্র। খেতেই হবে তোকে—তো না হলে পরীক্ষায় পাশ করতেই পারবিনে।"

পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারে 'মেড-ইজিব' কাজ করবে জেনে অগত্যা আমি একটু নরম হই। পরম ভক্তি জানাতে যাচ্ছি, এমন সময়ে উপগ্রহটিই বলে ছায়—না না, পূজো করবার আবশ্যক নেই। হস্তী পূজোর ব্যবস্থা তো নেই এদেশে। নিত্য কর্মপদ্ধতিতে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। পূজো করার দরকার করে না, আস্তাবলে ওকে অমনি বেঁধে রাখলেই হবে। গায়ে জলের ছোঁয়াচটিও না লাগে, সহিস্‌ কেবল এই দিকে কড়া নজর রাখে যেন।

"সহিস্‌ ? হাতীর আবার সহিস কি ? মাহুতের কথা বলছ বোধহয় ?" কাকা জিজ্ঞাসা করেন।

"সহিস, মানে যে ওর সেবা করবে, ওকে সইবে। সহিস কাঁধে বসলেই মাহুত হয় কিনা। কিন্তু ওর কাঁধে বসা যাবে না তো। ভয়ানক অপরাধ তাতে।" উপগ্রহটি ব্যাখ্যা করে ছায়। সঙ্গে সঙ্গে হাতীর উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার করে কিংবা নিজের মাথাই চুলকায় কিনা কে জানে।

"ওর স্নানের ব্যবস্থা তো হোলো, আচ্ছা, এবার ওর আহারের ব্যবস্থাটা শুনি"—কাকা উদ্‌গ্রীব হন, "সাধারন হাতী তো নয় যে

সাধারণ খাবার খাবে”—তারপর কি যেন একটু ভাবেন—“খায় টায় তো, না তাও বন্ধ ?”

তাঁর অদ্ভুত প্রশ্নে সবাই আমরা অবাক হই। বলে ফেলি—খাবেনা কি বলছেন ? অত বড়ো দেহ টিকবে কেন তাহলে ? কথায় বলে হাতীর খোরাক !

“আমি ভাবছিলাম, চানটানের পাট যখন নেই তখন খাওয়া দাওযার হাঙ্গাম্ আছে কিনা কে জানে।” কাকা ব্যক্ত করেন “তা কী খায় বলতো ?

উপগ্রহটি বলে, সব কিছুই খায় সে-বিষযে ওর রুচি খুব উদার। মানুষ পেলে মানুষ খাবে, মহাভারত পেলে মহাভারত। মানে মানুষ আর মহাভরতের মাঝামাঝি যা কিছু আছে সবই খেতে পাবে। যদি নাগালে পায—মানে, ওর গালে পায যদি।

আমি টিপ্‌নি কাটি—তাহলে হজম শক্তি তো বেশ।

“ভালো, খুবই ভালো।” কাকা সন্তোষ প্রকাশ করেন, “যদি মানুষ পায়, কতগুলো খাবে ? অবশ্যি টাট্‌কা মানুষ ?”

যতগুলো ওর কাছাকাছি আসবে। টাট্‌কা বাসি নিয়ে বড়ো বিশেষ মাথা ঘামাবে বলে মনে হয না। বলছি তো ভারী উদার রুচি। সর্বজীবে সম দয়া।

“তুই ওর কাছে যাস্‌নে যেন খবরদার।”—কাকা আমাকে সাবধান করেন, “তবে তোকে মানুষের মধ্যেই ধরবে কিনা কে জানে।”

হ্যাঁ, তা ধরবে কেন ? আমি মনে মনে রাগি, তা যদি ও না ধরতে পারে, তাহলে ওকেইই বা কে মানুষের মধ্যে ধরতে যাচ্ছে ? ওর রুচি যেমনই হোক, ওর বুদ্ধিশুদ্ধির প্রশংসা আমি তো করতে পারব না। একটা কাকার মধ্যেই গণ্য করব আজ থেকে।”

তবু একেবারেই নিশ্চিন্ত হতে চান কাকা—“খাদ্য হিসেবে কি ধরণের মানুষের ওপর ওর বেশি ঝোঁক ?”

একবার কটাক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে নেন, যেন আমার জন্যেই যতো ওঁর ভাবনা।

"চেনা লোকেরই অধিক পক্ষপাতী, চেনাই পছন্দ করবে বেশি। তবে অচেনাদের ওপরে তেমন আক্রোশ নেই। তাদেরও ধরে খাবে।"

ভালো ভালো। আর কতগুলো বরে মহাভারত—প্রত্যেক ক্ষেপে ?

ক্ষেপে গেল কতো খাবে বলতে পারিনে—হয়তো পুরো একটা সংস্করণই সাবড়ে দিতে পারে।

বলছো কি ?

অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত ইয়া ইয়া মোটা এক হাজার কপি— অনায়াসে। উপগ্রহটি জোরের সঙ্গে জানায় —অবহেলায়।

"—সচিত্র মহাভারত ?" কাকা আরো ভালো করে জানতে চান।

"সচিত্র ? ছবির দিকে ভ্রূক্ষেপই করবে না।"

"হাতী বোধহয় ছবির মর্ম" আমি যোগ করি।

"না বুঝুক।" কাকা আমার প্রতি বোষকষায়িত হন—"সবাইকেই চিত্রকলার সমঝদার হতে হবে তার কি মানে আছে ?"

উপগ্রহের প্রতি প্রশ্ন হয় —"সেকথা যাক। মানুষ আর মহাভারত ছাড়া আর কি কি খাবে ?" খুটিনাটি সব জেনে রাখা ভালো।

"ইট পাটকেল পেলে মহাভারত ছোঁবেও না, শালদোশালা পেলে ইট পাটকেলের দিকে ফিরেও তাকাবে না, আবার শালদোশালা ছেড়ে বেড়ালকেই বেশি পছন্দ করবে, কিন্তু রসগোল্লা যদি পায় বেড়ালকেও ছেড়ে দেবে। রসগোল্লা ফেলে কলাগাছ খেতে চাইবে, মানে, এক আলিগড়ের মাখন ছাড়া সব কিছুই খাবে। অক্লেশে।"

কেন, মাখন নয় কেন ? মাখন তো সুখাদ্য।

মাখনকে ঠিক ধরতে পারবে না কিনা। শুঁড়েই লেগে লেপটে থাকবে, ওকে কাবদায় আনা কঠিন তো।

ও! কাকা বুঝতে পারেন এইবার।

"হ্যা, সে কথা ঠিক। মাখন বাগানো সহজ নয় বটে।" আমি বলি, "এক পাঁউরুটি ছাড়া আর কেউ বাগাতে পারে না।"

"যাক খাদ্য তো হোলো, এখন পানীয়।" কাকা জিজ্ঞাসু।

"তরল পদার্থ যা কিছু আছে। দুধ, জল, ঘোলের সরবৎ, ক্যাষ্টর অয়েল, মেথিলেটেড স্পিরিট—কত আর নাম করবো? কার্বলিক য়্যাসিডেও কিছু হবে না ওর, তারও দু-দশ বোতল হু চুমুকে ফুঁকে দিতে পারে। কেবল শুধু চা খায়না।"

"ওটা গুড্ হ্যাবিট। ভাল ছেলের লক্ষণ।" কাকা ঈষৎ খুসী হন, "শিগারেট টানতেও শেখেনি নিশ্চয়? সবই তো জানা হোলো, কিন্তু কী পরিমাণ খায় তা তো বললে না হে?"

"যতো জুগিয়ে উঠতে পাববেন। এক আধ মণ, এক আধ নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবে।"

"তার আর কি হয়েছে? কেবল এক মানুষটাই পেরে উঠবো না বাপু, ইংরেজ রাজত্ব কিনা। হাতীকে কিম্বা আমাকে—কাকে ধরে ফাঁসিতে লটকে দ্যায় কে জানে! তবে আজই বাজারে যত মহাভারত আছে বইয়েব দোকানে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। ময়রাদের বলে দিচ্ছি রসগোল্লার ভিয়েন বসিয়ে দিতে। আমার কলাবাগানটাও ওরই নামে উইল করে দিলাম। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করুক। আর ইটপাটকেল? ইটপাটকেলের অভাব কি? আস্তাবল বানিয়ে যা বেঁচেছে ওর অস্তানাব পাশেই স্তূপাকার হয়ে আছে। যতো খুসি খাক না। যা ওর পেটে ধরে—ইচ্ছেমতো খাক, কোনও আপত্তি নেই আমার।"

অতঃপর মহা সমারোহে হাতীকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হোলো। আমরা সবাই শোভাযাত্রা করে পিছু পিছু গেলাম। শেকল দিয়ে ওর চার পা বেঁধে আটকানো হোলো শক্ত খুঁটির সঙ্গে। শুঁড়টাকেও বাধা হবে কি না আমি শুধাই। শুঁড় ছাড়া থাকবে জানতে পারা যায়। শুঁড় দিয়েই ওরা খায় কি না, কেবল তরল ও স্থূল খাদ্যই নয়, হাওয়া খেতে হলেও শুঁড়ের দরকার।

হাতীর দাম শুনে তো আমার চক্ষুস্থির। পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম নয়। যে লোকটা বেচেছে সে থাকে দুশো ক্রোশ দূরে; তার এক আত্মীয় শ্যামরাজ্যের জঙ্গল-বিভাগের কর্মচারী—সে-ই সেখান

থেকে ধরে ধরে চালান ছায়। উপগ্রহটি অনেক করে তাকে জপিয়ে আরো কেনার লোভ দেখিয়ে তবেই এটি তার কাছ থেকে এত কমে আদায় করতে পেরেছে। নইলে হয়তো লাখটাকই এর দাম লাগতো! আসলে এর দামই হয় না, অমূল্য পদার্থই বলতে গেলে এই শ্বেতহস্তী।

হাতীকে এতদূর হাঁটিয়ে আনতে, আর তার সঙ্গে হেঁটে আসতে ভদ্রলোকের কি কম কষ্ট হয়েছে! কিন্তু কী করবেন, কাকার হুকুম। কেবল সেই জন্যেই—নইলে কে আর প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এমন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক শ্বেতহস্তীর সঙ্গে এতটা হেঁটে আসে।

তাত বটেই, তাত বটেই। কাকা অম্লানবদনে তখনি তাকে পঞ্চাশ হাজারের একখানা চেক কেটে ছান।

আরো আছে এমন, আরো আনা যায়, উপগ্রহটি জনায়, এরকম শ্বেতহস্তী যতো চান, দশ বিশ পঞ্চাশ—ওই এক দর কিন্তু।

আরো আছে এমন? কাকা এক মুহূর্ত একটু ভাবেন, বেশ, তুমি আনাবার ব্যবস্থা করো। তাতে আর কি হয়েছে, পচিশ লাখ টাকায় শ্বেতহস্তাই কিনবো না হয়। কী হয়েছে?

"বড মানুষের বড় খেয়াল!" সেই পুরাতন গ্রহটি এতক্ষণে বাঙনিস্পত্তি করে,—'তা নাহলে বড়লোক কিসের?"

সেই পুরাতন কথা—পুরাণ-কাহিনী!

ছুদিন যায় পাচদিন যায়। হাতীটাও বেশ আরামে আছে। আমরা ছুবেলা দর্শন করি। কাকা আর আমি দেখি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে; কাকিমা ছাখেন ভক্তিভরে। কাকিমা অনেককিছু মানৎও করেছেন, হাতীর কাছে ঘটা করে পূজো আর জোড়া বেড়াল দেবেন জানিয়েছেন। কাকিমার এখনো ছেলে-পুলে হয়নি কি না।

কলা গাছ খেতেই ওর বেশি উৎসাহ যেন। ইট পাটকেল পড়েই আছে, স্পর্শও করেনি। ছু একটা বেড়ালও এদিক ওদিক দিয়ে গেছল, হাতীকে তারা ভালো করেই লক্ষ্য করেছে, ও কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। গাদা গাদা মহাভারত কোণে পুঁজি-করা—তার

থেকে একখানা নিয়ে ওকে আমি দিতে গেছলাম একদিন। পাওয়া মাত্র উদরস্থ করবে এই আমি আশা করেছি কিন্তু মুখে দেয়া দূরে থাক, বইখানা শুঁড়তলগত না করেই এমন সজোরে আমার দিকে ছুঁড়েছিল যে আর একটু হলেই আমার মাথা উড়ে যেত।

কাকা বললেন, বুঝতে পারলিনে বোকা! তোকে পড়তে বলছে। ধর্মপুস্তক কিনা! মন দিয়ে পড়। মুখ্যু হয়ে থাকলি, ধর্ম শিক্ষা তো হোলো না তোর একটুও!

ধর্মশিক্ষা মাথায় থাক্। কাকার পুণ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছি এই ঢের! না, এরপর থেকে এইসব ধর্মাত্মা হাতীর কাছ থেকে সাত হাত দূরে থাকতে হবে।

এইভাবে হপ্তাতিনেক কাটার পর হঠাৎ একদিন বৃষ্টি নামলো। মুষল-ধারে বৃষ্টি! মুড়ি নিয়ে পাঁপরভাজা দিয়ে অকালবর্ষণটা আমরা উপভোগ করছি। এমন সময় মাহুৎ কিম্বা সেই সহিস এসে খবর দিল বাদ্‌লার সাথে সাথে হাতীটা ভয়ানক ছটফটানি সুরু করেছে। হাকডাক ছাড়ছে খুব। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটলাম আমরা সবাই।

কী ব্যাপার? সত্যিই ভারি ছটফট করছে হাতীটা। মনে হয় যেন চার পা তুলে লাফাতে চাইছে।

কাকা মাথা ঘামান খানিকক্ষণ। তারপর বলেন—বুঝতে পারা গেছে। মেঘ ডাকছে কিনা! মেঘ ডাকলে ময়ূর নাচে। হাতীও নাচতে চাইবে তার আশ্চর্য কি! ময়ূর আর হাতী—আকারে প্রকারে এক না হলেও আসলে ওরা সগোত্র। ভেবে ছাখো, কার্তিক আর গণেশ দুই মা দুর্গার ছেলে। কার্তিক ময়ূরকে বাহন করেছেন। আর গণেশ হাতীকে মাথায় ঠাঁই দিয়েছেন! হাতীর মাথা বহন করছেন।—যাই হোক, ওর তিন পায়ের শেকল খুলে দাও—কেবল এক পায়ের বাঁধন থাক। নাচুক একটু।

তিন পায়ের শেকল খুলতেই ও যা সুরু করল, হাতীর ভাষায়, তাকে নাচই বলে থাকে বোধহয়। কিন্তু সেই নাচের উপক্রমেই,

আরেক পায়ের শেকল ভাঙতে দেরি হয় না। মুক্তি পাবা মাত্র হাতীটা ঊর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়ে সহিস বাধা দেবার সাহস করায় আগেই এক শুঁড়ের ঝাপটে ওকে শুইয়ে দিয়ে যায়।

তারপর করুণ আর্তনাদ করতে করতে মুক্তকচ্ছ হাতী শুঁড় তুলে ছুটতে থাকে সদর রাস্তা ধরে। আমরাও, দস্তুরমতো ব্যবধান রেখে পেছনে পেছনে ছুটি। কিন্তু হাতীর সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে পারবো কেন? আমাদের মানুষদের মাত্র দুটি করে পা, তার হাতীর তুলনায় তাও সরুসরু। দেখতে না দেখতেই হাতীকে আর দেখা যায় না, কেবল তার ডাক শোনা যায়। অতি সুদূর থেকে তার গর্জন ভেসে আসে।

তিনঘণ্টা পরে খবর এলো, মাইল পাঁচেক দূরে, এক পুষ্করিণীতে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আত্মহত্যা করবে নাকি হাতীটা? শ্বেতহস্তীর কাণ্ড, কিছুই বোঝা যায় না। কাকিমা কাঁদতে সুরু করে দিলেন, হয়তো ঠিকমতো পুজো আচ্চা হয়নি, দেবতা তাই রুষ্ট হয়েছেন। ক্ষেপে গিয়ে শাপ দিলে এখন কি সর্বনাশ হয় কে জানে। শেষে বংশলোপই হবে হয়তো।

বংশ বলতে তো সর্বসাকুল্যে আমি, যদিও পরস্মৈপদী। কাকিমার কান্নায় আমারও কান্না পায়।

কাকা এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে ছোটেন শ্বেতহস্তীরে প্রসন্ন করতে। আমরাও সদলে চলি কাকার সঙ্গে। কিন্তু হাতীর যেরকম নাচ আমি দেখেছি তাতে সহজে ওকে হাতানো যাবে বলে আমার মনে হয় না।

পথের ধারে মাঝে মাঝে ভাঙা আটচালা নজরে পড়ে, সেগুলো বাদলার ঝাপটে না হাতীর দাপটে কিসে উড়েছে বোঝা যায় না ঠিক। আশে পাশে জনপ্রাণীও নেই যে জিজ্ঞেস করে জানবো। যতদূর সম্ভব হস্তীবরেরই কীর্তি! শ্বেতশুণ্ডের প্রাদুর্ভাব দেখেই বাসিন্দারা মুল্লুক ছেড়ে সটকেছে এই রকমই আমার মালুম হয়।

কিছুদূর গিয়ে হস্তীলীলার আরো ইতিহাস জানা যায়। একদল গঙ্গাযাত্রী একটা আধমড়াকে গঙ্গায় নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময়ে চতুষ্পাদ

মহাপ্রভু এসে পড়েন। অমন ঘটা করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে রাস্তা জুড়ে যাওয়াটা ওঁর মনঃপুত হয় না, শুঁড় নেড়ে উনি ওদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। শোনা গেল এক একজনকে অনেক দূর অব্দি তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। কেবল বাদ দিয়েছেন, কেন জানা যায়নি, সেই-গঙ্গা-যাত্রীকে। সে বেচারা অনেকক্ষণ একলা অবহেলায় পড়েথেকে, কাউকে আসতে না দেখে অগত্যা উঠে বসে দেহরক্ষা কাজটা এযাত্রা স্থগিত রেখে, কারো কাঁধ না পেয়ে নিজের পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরে গেছে—শেষমেষ।

অবশেষে সেই পুকুরের ধারে আমরা এসে পড়ি। কাকা হাতীর বহু সাধ্যসাধনা, বহুৎ স্তবস্তুতি করেন। হাতীটা শুঁড় তুলে শোনে, কিন্তু মোটেই নড়ে না। রসগোল্লার হাঁড়ি ওকে দেখানো হয়, ঘাড় কাৎ করে দ্যাখে কিন্তু হাঁড়ির সঙ্গে মোলাকাৎ করার তার আগ্রহ দেখা যায় না।

পুকুরটা খুব বড় নয়, কাকা একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ান, কাছাকাছি কথা কইলে যদি ফল হয়। কিছু ফল হয়, কেননা, হাতীটা কাকা-বরাবর তার শুঁড় বাড়িয়ে দ্যায়।

আমি বলি—পালিয়ে এসো কাকা। ধরে ফেলবে।

দূর্! আমি কি ভয় খাবার ছেলে? তোর মতন অত ভীতু নই আমি।—কাকার সাহস দেখা যায়,—কেন, ভয় কিসের? আমাকে কিচ্ছু বল্‌বে না। আমি ওর মনিব—মনিব—উঁহু—শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু—

বলতে গিয়ে কাকা জিভ কাটলেন, বোধহয়, কাকিমাকে স্মরণ করে।—উঁহু, মনিব কেন হব? অপরাধ নিয়োনা প্রভু শ্বেতহস্তী। আমি তোমার দাসানুদাস। আমি তোমার শ্রীচরণের—তোমার চারপায়ের গোলাম। কি বলতে চাও বলো, আমি কান বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমার ভক্তকে তুমি কিছু বলবে না আমি জানি। হাতীর মতো কৃতজ্ঞ জীব দুনিয়ায় দুটি নেই, আর তুমি তো সামান্য হাতী নও, তুমি হচ্ছো হাতী সম্রাট।

কাকা কান বাড়িয়ে দ্যান, হাতী শুঁড় বাড়িয়ে দ্যায়—আমরা রুদ্ধশ্বাসে উভয়ের আলাপের অপেক্ষা করি।

কর্ণহস্তিসংবাদ দেখি উৎকর্ণ হয়ে।

হাতীটা কাকার সর্বাঙ্গে তার শুঁড় বুলায়, কিন্তু সত্যিই কিছু বলে না। কাকার সাহস বেড়ে যায় আরো, কাকা আরও এগিয়ে যান। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন,—দেখছিস কেমন আদর করছে আমায়?

কিন্তু হাতীটা অকস্মাৎ শুঁড় দিয়ে কাকার কান পাকড়ে ধরে। কানে হস্তক্ষেপ করায় কাকা বিচলিত হন—কেন বাবা হাতী? কী অপরাধ করেছি বাবা তোমার শ্রীচরণে যে এমন করে তুমি আমার কান মলছো?

কিন্তু হস্তীরাজ কর্ণপাত করেন না। হস্তিনাপুর আর কর্ণাট, ম্যাপে ঠিক পাশাপাশি না হলেও, এখানে জমাট হয়ে থাকে। কাকার অবস্থা ক্রমেই করুণ হয়ে আসে, তিনি আমার উদ্দেশে—চেষ্টা করেও আমার দিকে তাকাতে তিনি পারেন না—বলেন—বাবা রাম, কান গেল, বোধহয় প্রাণও গেল। তোর কাকিমাকে বলিস।

বাবা রাম ব্যাপার দেখে হাবারাম। কী করবে ভেবে পায় না।

কাকা আর্তনাদ করতে থাকেন।

আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠি; কাকাকে ধরি গিয়ে। জলের মধ্যে একা হাতী, স্থলের ওপর আমরা সবাই। হাতীর চেষ্টা থাকে কাকার কান পাকড়ে জলে নামাতে, আর হাতীর চেষ্টা যাতে ব্যর্থ হয় সেই দিকেই আমাদের চেষ্টা। মিলনান্ত কানাকানি শেষে বিয়োগান্ত টানাটানিতে পরিণত হয়। কান নিয়ে এবং প্রাণ নিয়ে টানাটানিতে।

খানিকক্ষণ এই টাগ-অফ-ওয়ার চলে। শেষটায় হাতী পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু কাকার কান শিকার করে তারপরে। হাতীর হাতে কান সমর্পণ করে কাকা এযাত্রা প্রাণরক্ষা করেন।

কাকার কানটা হাতী মুখের মধ্যে পুরে দ্যায়, কিন্তু খেতে বোধহয় ওর ভালো লাগে না। সেইজন্যই সে কান ফেলে এবার রসগোল্লার হাঁড়ির দিকে তার শুঁড় বাড়ায়।

যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে কাকা বকেন—দিস্‌নে খবরদার, দিস্‌নে ওকে রসগোল্লা! হাতী না আমার চৌদ্দ পুরুষ! পাজী ড্যাম্ শুয়ার রাস্কেল গাধা ইষ্টুপিট! উঃ, কিচ্ছু রাখেনি কানটার গো, সমস্তটাই উপড়ে নিয়েছে! উল্লুক বেয়াদব আহাম্মোক!

কাকার কথা হাতীটা যেন বুঝতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে আসে। ও হরি! একি দৃশ্য! গলার নীচে থেকে যে পর্যন্ত জলে ডুবে ছিল হাতীর কলেবর একেবারে কুচকুচে কালো, যেমন হাতীদের হয়ে থাকে, কেবল গলার উপর থেকে সাদা। অ্যা, এ আবার কী?

তাকিয়ে দেখি পুকুরের কালো জল হাতীর রঙে সাদা হয়ে উঠেচে! শ্বেতহস্তীর এ আবার কোন্ লীলা?

কর্ণহারা হয়ে সে শোকও কাকা কোনোমতে এ পর্যন্ত সামলে ছিলেন, কিন্তু হাতীর এই চেহারা তাঁর অসহ্য হয়। তাঁর অত সাধের সাদা হাতী!

মূর্চ্ছিত কাকাকে ধরাধরি করে আমরা বাড়ী নিয়ে যাই। হাতীর দিকে আর ফিরেও তাকাই না আমরা। একটা বিশ্রী, বদ্ কালো ভুতের মত চেহারা, কদাকার কুৎসিৎ বুড়ো হাতী! উনি যে কোনো জন্মে সোহাব সিংহাসনে বসে রাজপূজা লাভ করেছেন একথা কখনো ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করা কঠিন।

পরদিন একটা লোক এক জরুরি খবর নিয়ে আসে—সেই অনুসন্ধানী উপগ্রহের প্রেরিত অগ্রদূত। উপগ্রহটি আরো পঞ্চাশটা শ্বেতহস্তী সংগ্রহ করে কাল সকালেই এসে পৌঁছচ্ছেন সেই খবর। কাকার আদেশে প্রাণ তুচ্ছ করে বহু কষ্ট স্বীকার করে দুশো ক্রোশ দূর থেকে চারপেয়ে হাতীদের সঙ্গে দু পায়ে পাল্লা দিয়ে সমান হেঁটে তিনি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু কে তুল্‌বে এই খবর কাকার কানে? মনে, কাকার অপর কানে?

গাড়ী ধরার ভারী তাড়া

সেবার প্লেগের ভয়ে শহর ছাড়তে হোলো। বিনির জন্যেই বেশি করে আরো। ইঁদুরে তার ভারী ভয়। আনাচে-কানাচে কোথাও কোনো নেংটির ল্যাজটুকু দেখলেও সে ডরিয়ে ওঠে। এম্‌নিতেই যা ভয়াবহ, স্বভাবতই, প্লেগাবহ হয়ে আরো তা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ালো। ইঁদুরকে দূর থেকে নমস্কার করে আমরা বিদূরিত হলাম।

ইঁদুরকে আমি ভয় খাইনে। আদৌ না। কেন খাবো? দেখেছি, ইঁদুররা আমাকে দেখলেই দৌড় মারে—এক দণ্ডও দাঁড়ায় না। ভালো করে যে দেখবো সে ফুরসৎটুকুও দেয় না। আর, যে আমার ভয়েই পালায় তাকে আবার আমি ভয় করি? আর, যদি সে কাছে আসে—এসে গায়ে পড়ে—তবেই না প্লেগ?

শ্রীরামপুর ডেরা নিলাম। কিন্তু নিলেই বা কি, আমার মত কলকাতাসক্ত লোকের পক্ষে কলকাতার মায়া কাটানো শক্ত ব্যাপার। রোজই আমায় কলকাতায় আসতে হয়—বেড়াতে, আড্‌ডা দিতে, কফি খেতে। (খাদ্য-কফি যা তরকারিতেই খাই তা নয়, অ-খাদ্য কফি—যা পান করতে হয়!) তাছাড়া আরো কতো আজে-বাজে ব্যাপারে—যার ঠিক ঠিকানা নেই।

সকালের ট্রেনে আসি, ফিরি সন্ধ্যের কিম্বা রাত্তিরে। গাড়ির যাতায়াতের সঙ্গে আমার গতিবিধি বাঁধা। আমার নাড়ির গতিবিধিও, বলতে কি!

তাই সেদিন সকালের চায়ের টেবিলে রেলোয়ের নূতন টাইমটেবিলে ট্রেনের চালচলনের রদবদল দেখে চমকে গেলাম। নাড়ির গতি

দ্রুততর হোলো আমার। দেখলাম, রেলকর্তৃপক্ষ সকাল আটটা চৌদ্দর গাড়িটিকে খারিজ করেছেন। আমাকে বিল্‌কুল না জানিয়েই। টেবিলের পাতাটা ছিঁড়ে বিনির হাতে দিলাম—"দেখছিস, কী সর্বনাশ করেছে আমার?"

স্বভাবতই, চটে গেলাম ভয়ানক। রেলগাড়ির সময়নিষ্ঠায় কোনো দিনই আমার আস্থা ছিল না। কিন্তু দেরি করে আসা, তাও বরং সওয়া যায়; কিন্তু এ যে একেবারেই না আসা! চিরদিনের মতই গা-ঢাকা দেওয়া। না, কারো এরকম বেচাল এমন কি রেলগাড়ি হলেও কখনই মার্জনা করা যায় না।

"তা, তোমার এতে রাগ কেন দাদা?" অবাক্ হয় বিনি।—"এতে তোমার কী এল গেল আমি তো বুঝিনে!"

মেয়েদের বুদ্ধি-বিবেচনা যে লোকে কম বলে তা এই জন্যেই। বোঝা যায় এতেই। বিনির বাক্যবিন্যাসেই মালুম হয়।

"আমার ভীষণ যায় আসে।" আমি বাৎলাই: "আমার জীবনধারাই বদলে যাবে এর জন্যে। মানে, বদলাতে হবে আমায়—বাধ্য হয়ে। আর, জীবনধারা বদলে যাওয়াটা কী—চট করে তা পাল্‌টে ফেলা যে কত কষ্টের—তুই তার কী বুঝবি? যার জীবন সেই বোঝে!" আমি দীর্ঘনিশ্বাস পাড়ি।

"শুনি তোমার জীবনচরিত। বুঝিয়ে বলো তো।" ও বলে।

"শুন্‌বি? শোন্ তাহলে।" নিজের বোঝা নামাই তখন: "কলকেতায় যাবার তিনটে মোটে গাড়ি ছিল. জানিস তো? মানে, আমি সকালের লোকালের কথাই বলছি। সাতটা পঞ্চান্নর গাড়ি, তারপরে আটটা তেইশে। শ্রীরামপুর এসেই আমি স্থির করলাম যে সকালের সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িই আমায় ধরতে হবে। কলকাতায় যেতে হলে ঐ গাড়িটাই সবার সেরা। স্থানীয় লোকের মুখেও ওর উচ্চপ্রশংসা শুনেছিলাম। পরের দুটোর মতন তত ভিড় থাকে না ওতে। বেশ হাত পা খেলিয়ে যাওয়া যায়। এমন কি, এক একদিন নাকি এতই

ফাঁকা থাকে যে গাড়ির মধ্যে পায়চারি করাও যায়—বাধা দেবার থাকে না কেউ কামরায়।…"

আমার ভ্রমণকাহিনীর মাঝখানে বিনি বাধা ছায়—"বুঝলাম বুঝলাম। দিব্যি পায়চারি করতে করতে কলকাতা যাওয়া যায়।"

"কথার মাঝখানে কথা পাড়িস এই তোর ভারী দোষ। বড্ডো বিচ্ছিরি। একটুও তোর আত্মসংযম নেই। তোর জন্যে কথার খেই হারিয়ে যায় আমার।…কী বলছিলাম? হ্যা, ভয়ঙ্কর ভীড় থাকে আটটা তেইশের গাড়িটায়। যতো আফিসের বাবুরা যায় কিনা সেইটেয়? সেই গভীরতার ভেতর এই বপু নিয়ে যদি বাপু আবার আমি সেঁধুই—ভিড়ি গিয়ে সেই ভিড়ে—এই অধমের দ্বারা উক্ত লোকালের লোকসংখ্যা আর একগুণ বাড়াই—না সেরূপ বিপুল বাসনা কোনদিনই আমার ছিল না।"…

"একগুণ? না পয়েন্ট জিরো জিরো জিরো একগুণ?" বিনি ধাক্কা মারে আবার। একেবারে শূন্যপুরাণ এনে ফ্যালে। "বাদুড়ঝোলা একটা ট্রেনে মোট কত লোক থাকে তোমার আন্দাজ?" শুধোয় আমাকে।

"০০০১ গুণ? তা, তুই বলতে পারিস। অঙ্কে তোর মাথা বেশি।" ওর গুণফল আমি মেনে নিই—মাথা পেতেই। নিজের গুনপণায় বিশ্বাস নেই আমার।

"তা সে যাই হোক্, আমার বক্তব্য হচ্ছে আটটা তেইশের গাড়িতে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাওয়ার চেয়ে সকালের সাতটা পঞ্চান্নয় যাওয়া ঢের শ্রেয়ঃ। ঢের আরামের। তাই এখানে এসেই আমি স্থির করলাম যে কলকেতায় যেতে হলে—আর, যেতেই তো হবে রোজ—যতো কাজে আর অকাজে—তাহলে—সকালের ঐ সাতটা পঞ্চান্নকেই পাকড়াতে হবে আমায়।"

"তুমি বলছো কী বল তো? মাথায় ঢ্কছে না মোটেই।" বিনি মাথা নাড়ে: "তুমি বললে যে আটটা চোদ্দর গাড়িটা বাতিল হয়েছে?

সাতটা পঞ্চান্ন তো হয়নি? সে তো তেমনি আছে—ছিল যেমন। যাচ্ছে-আসছে আগের মতই? তবে? তাহলে তোমার অসুবিধাটা হোলো কোন্‌খানে?"

"কোন্‌খানে! টের পাচ্ছিস না তুই?"

"একদম্ না। আর তাছাড়া বাপু, সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িতে তো তুই যাও না কক্ষনো। একদিনও যেতে দেখিনি তোমায়—।"

"গেছি কি যাইনি সেথকা তো উঠছে না এখানে। আসল কথা, ঐ গাড়িতেই যাবার বাসনা আমার বরাবরের। সর্বদা ঐ ট্রেনটাই আমি ধরতে চেয়েছি। সাতটা পঞ্চান্নরটা বাতিল হলে তো তোমাকে আরো কাহিল করতো। দুঃখের আমার থই থাকতো না। কেননা তখন আমাকে ধরবার জন্যে আরেকটা গাড়ি ঠিক করতে হোতো বাধ্য হয়ে। কিন্তু তুই দেখতেই পাচ্ছিস সাতটা পঞ্চান্নকে না করে ওরা বরবাদ করেছে আটচা চোদ্দকে এবং এটা আমার ধারণায় আরো বেশি সঙ্গীন ব্যাপার। আমার জীবন-যাত্রার ওলোট পালোট হচ্ছে এর জন্যেই। মানে, এর ফলে, আমার সকাল বেলার সব প্রোগ্রাম্ উনিশ মিনিট করে এগিয়ে দিতে হচ্ছে। আর উনিশ, কিছু চাট্টিখানি না। খুব কম সময় নয়। একটা জীবনে রোজ রোজ এই উনিশ মিনিট—যদি আমাদের এই নগর-জীবনের কথা ভালো করে একবার বিবেচনা করা যায়।"

"উনিশ মিনিট এগিয়ে দিতে হচ্ছে কেন শুনি?" তথাপি সে বুঝতে পারে না।—"আর, এগুচ্ছোই বা তুমি কি করে শুনি?"

"কি করে? যারপরনাই কষ্ট করে। তার—তুই কী বুঝবি? হতভাগা রেলওয়ালাদের বদখেয়ালে এখন থেকে আমকে আরও উনিশ মিনিট আগে বিছানা ছাড়তে হবে! আর, সকাল বেলায় বিছানা ছাড়া—সে যে কী কষ্টের! ঘুম জিনিসটা কখনোই ফেল্‌না না—সকাল বেলায় তো নয়ই। সেই ঘুম ফেলে ওঠা যে কী কঠিন সে খালি

আমিই জানি। সেটা আমাকে এখন থেকে আরো উনিশ মিনিট আগে জানতে হবে। ঘড়িটাকে অ্যালার্মিং করতে হবে সেইমতন। তারপরে আবার দাড়ি কামানো—আর এক ঝঞ্ঝাট। তাও সারতে হবে উনিশ মিনিট আগে। তারপর প্রাতরাশ। তোর বানানো ডিমসেদ্ধ, টোস্ট, পোচ্, চা ইত্যাদির শ্রাদ্ধ করতে হবে উনিশ মিনিট আগেই। এই সব প্রাতঃকৃত্য সেরে সুরে তেড়ে ফুঁড়ে বেরুতে হবে ট্রেন ধরতে। পড়ি কি মরি করে ছুটতে হবে আমায়—"

"উনিশ মিনিট আগে।" ও-ই সম্পূর্ণ করে দেয়।—"কিন্তু কেন, তা বলো দেখি।"

"কেন?" আমি ওর দিকে তাকাই। তাকিয়ে থাকি খানিক।

আমার মনে হয়, যতটা নয়, তারও বেশী বোকা বলে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করে সে এক এক সময়। তার বোকামির বহর দেখিয়ে আমায় তাক্ লাগাতে চায় কিনা ওই জানে!

"কেন? কেন এই উনিশ মিনিট? এই তোর—এত অঙ্কের মাথা?" না বলে আমি পারিনে: "আটটা চোদ্দর থেকে সাতটা পঞ্চান্ন বিয়োগ কর্, তাহলেই তুই টের পাবি। দেখতে পাবি যে ঠিক উনিশ মিনিটের ফারাক্।"

"কিন্তু বাপু তুমি তো সাত জন্মেও আটটা চোদ্দয় যাও না। তুমি যাও আটটা তেইশে। গাড়িটা ষ্টেশনের বাঁক ঘুরে এদিক দিয়েই যায় তো···আর, যাবার সময়ে আমি তো এই জানালাতেই দাঁড়িয়ে থাকি। দেখতে পাই যে তুমি দরজার হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলেছো। আমার এমন ভয় করে বাপু—" বলতে গিয়ে সে শিউরে ওঠে।

"করবেই তো! আমারই কি করে না? কিন্তু করলে আর কী করছি। আটটা তেইশের গাড়িতে যা বেধড়ক্ ভিড়! ভেতরে পা বাড়াবো তার যো কি! দরজার মুখের লোকেদের ঠেলে ঢুকতে পারলে তো?"

"তবে? তোমার গাড়ি যখন সেই আটটা তেইশেই, তখন কেন যে তোমাকে উনিশ মিনিট আগে তৈরি হতে হবে তার তো কোন মানে

পাইনে। হোলোই বা বাতিল আটটা চোদ্দ, বয়েই গেল! তাতে তোমার কী যায় আসে?"

অতি কষ্টে আমি নিজেকে দমন করি—যদিও আমি দেখেছি দমন করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। আলুর দমের মতই সোজা। তাহলেও, চেষ্টা করেই নিজেকে দমাই। দমিয়ে—মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে—সহজবোধ্য ভাষায়—যেমন করে দুগ্ধপোষ্যদের বোঝায়—সেইভাবে ওকে সমৃঝাতে লাগি :

সবাই জানে সকলের জন্যেই তিনটে করে সকালের ট্রেন, দুনিয়ার সব জায়গাতেই। একটা সে ধরতে চায় (আমার ক্ষেত্রে এখানে যেটা সাতটা পঞ্চান্ন), একটা সে ধরতে গিয়ে একটুর জন্যে ফেল করে (আমার বেলা যেটা আটটা চোদ্দর), আর একটায় সে শেষ পর্যন্ত যায় (আমার সম্পর্কে যেটা হচ্ছে আটটা তেইশ)। অতএব, শ্রীবিনি, তোমাকে আমার করযোড়ে মিনতি, এবং বিনতি,—দয়া করে আমার সকালের খাবারটা এবার থেকে আরো উনিশ মিনিট আগে বানাবে কাল থেকে—মানে, কাল সকাল থেকেই—আমার জীবনের গতি উনিশ মিনিট এগিয়ে গেল, সর্বদা মনে রেখো একথা। কাল থেকে আমায় সাতটা ছত্রিশের গাড়ি ধরবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে হবে—"

"কিন্তু সাতটা ছত্রিশে তো কোনো গাড়ি নেই দাদা।" সে জানায়।

"নেই আমি জানি। কিন্তু তোর মতন মুষ্টিমেয় বুদ্ধি নিয়ে চলতে হলে কলকাতা আমার পক্ষে গয়া। চিরদিনের মতই সুদূর-পরাহত। কোনো জন্মে সেখানে আর আমায় পৌঁছুতে হবে না। সাতটা ছত্রিশে যে কোনো গাড়ি নেই সেকথা আমার বেশ জানা আছে কিন্তু তাহলেও অতি আধুনিক কবির মতন, এই গাড়িটা আমাকে কষ্টকল্পনা করতে হবে। কেননা, সাতটা ছত্রিশের গাড়ি ধরার চেষ্টায় গেলেই তবেই আমি সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িটা ফেল্ করতে পারবো। যাবো আমি সেই আটটা তেইশে—বাদুড়ের মতন ঝুলে—রোজ যেমন যাই।"

টুনুর স্বর্গ থেকে পতন !

(কিংবা উপসর্গ থেকেই ?)

প্রথম দেখাতেই ভদ্রলোককে ভালো লেগে গেল টুনুর। ইস্কুলের ছুটির পর বই-বগলে চীনে-বাদাম চিবুতে চিবুতে বাড়ী ফিরছে, পাড়ার ছেলেদের জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়্ল। সাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে—ওঁর নিজেরই সাইকেল,—সৌভাগ্যবান ভদ্রলোক, সন্দেহ কি ! সাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে ভদ্রলোক হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিয়ে ছেলেদের বোঝাচ্ছিলেন। বোঝাবার কোনও দরকারই ছিল না, কেন না, স্পোর্ট্‌সের প্রয়োজনীয়তা জানে প্রত্যেক ছেলেই। ফুটবল্‌ খেলা যে জীবনধারণের পক্ষে জলবায়ুর মতই অত্যাবশ্যক, ছেলেদের তা বোঝাতে যাওয়াই বেশী। কেননা কোনও বালকেরই তা অজানা নেই।

টুনুও জানে এ কথা। এবং টুনু এও জানে, জীবন থেকে ফুটবল্‌ বিয়োগ করলে ফল দাঁড়ায় শূন্য। সে জীবনের কোনও মানেই হয় না। প্রাণবিয়োগের মতই আর কি। এবং যদি তাকে সুযোগ দেয়া হয় তা হ'লে বক্তৃতা করে হাত পা নেড়েও এ কথা সে বলতে পারে। ঐ ভদ্রলোকের চেয়েও ঢের ভালোই পারবে সে।

কিন্তু মাইকেল ছেলেদের কাছে যেমন ভীতিকর, সাইকেল তেমনি প্রীতিজনক (সাইকেল-ওয়ালা যদি ভদ্রলোক নাও হয় তবুও আকর্ষণের বস্তু,—ভদ্রলোক হলে তো বলাই বাহুল্য !)। তাই ছেলেরা সবাই একযোগে হাঁ করে জানা কথাই নতুন করে জানছিল আবার।

অবশেষে সমস্ত কথার সারমর্মে এসে পৌঁছান্‌ ভদ্রলোক। ওঁদের

বয়েজ স্পোর্টিং বলে কি একটা ক্লাব আছে লেক-এরিয়ার কাছাকাছি, ওদের সব হতে হবে সেই ক্লাবের সদস্য, আর দিতে হবে চাঁদা— নিয়মিত বা অনিয়মিত যেরকম ভাবে ওদের সুবিধা। চাঁদার পরিমাণ অবশ্য এখন জানা গেল না,—সদস্যদের আনন্দের পরিমাণ ও পকেটের পরিণাম থেকে সেটা পরে ঠিক হবে।

বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে টুনুকে লক্ষ্য করছিলেন ভদ্রলোক। টুনুও বেশ গর্ব বোধ করছিল মনে মনে। এমন একটা চমৎকার লোকের বারংবার চক্ষুগোচর হচ্ছে ও। আর না হবেই বা কেন? ক্লাসের মধ্যে,—কেবল ক্লাসই বা কি—সারা ইস্কুলের মধ্যে, টুনুর মত স্মার্ট ছেলে আর কে আছে শুনি?

"তোমায় কোথায় যেন দেখেছি খোকা! নাম কি তোমার?" তাকে লক্ষ্য করেই ভদ্রলোক প্রশ্নবাণ ছাড়েন।

কোথায় যে সাক্ষাৎ হয়েছে টুনুর স্মরণ হয় না। নামটা বলবে কি বলবে না, ইতস্ততঃ করছে, পাড়ার একটা ছেলে অযাচিতই বলে দেয়—"ওর নাম টুনু।"

টুনু! ভারি রাগ হয় ওর। নাম বলতে হয়, ও নিজে বলবে। ওর নিজেরই নাম তো! কেন, ভালো নাম কি ছিল না তার? টুনু! ঐ ছোট্ট এক টুক্‌রো ওর নেহাৎ অপছন্দ-নামটা এই উল্লেখযোগ্য মানুষটির কাছে ফাঁস না করলেই কি চলত না?

টুনুর মুখ লাল হয়ে ওঠে। লজ্জায় আর রাগে।

"টুনু! বাঃ, বেশ নাম তো! কোন্ ইস্কুলে পড় তুমি?"

ওর মনে হল অন্য একটা ইস্কুলের নাম করে দেয় এবং ক্লাসের প্রসঙ্গ উঠ্‌লে দু ক্লাস, নিদেন্ পক্ষে এক ক্লাস বাড়িয়ে বলে অন্ততঃ। কিন্তু মনের কথা মুখ অবধি পৌঁছতে না পৌঁছতে সেই উন্মুখ ছেলেটা আবার মুখর হয়ে ওঠে—"সাউথ সুবর্বন্, স্যার্!"

"কী বল্লে, সাউথ সুন্দর বন? সুন্দর বনে আবার ইস্কুল আছে নাকি? জানতাম না তো!"

ভদ্রলোকের রসিকতার চেষ্টায় সব ছেলেই হো-হো করে ওঠে। কেবল টুনুই হাসতে পারে না। মনে মনে গোঁ গোঁ করে সে।

আর এক মিনিট্ও দাঁড়ায় না টুনু। গম্ভীর চালে চলে যায় সেখান থেকে।

কয়েক দিন পরে এক বিকেলে, ইস্কুল থেকে বেরুবার মুখেই আবার দেখা। তাকে দেখতে পেয়েই সাইকেল থামান ভদ্রলোক।

—"এই যে টুনু! ছুটি হয়ে গেল বুঝি।"

টুনু ঘাড় নাড়ে। কী আর বলবে? ছুটি যে হয়েছে এবং সোরগোল করেই হয়েছে সে তো একেবারেই প্রত্যক্ষ ব্যাপার! এমন গায়ে-পড়া প্রশ্নের জবাব দিতে দায় পড়েছে তার।

—"আমার সাইকেলের ব্যাকে বসো। চল, তোমার বাড়ীর রাস্তা অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি তোমায়।"

সাইকেলের কথায় টুনুর লোভ হয়। সেদিনকার সুন্দর বনের ইঙ্গিতের সব রাগ তার জল হয়ে যায় মুহূর্তে। টুনু ওকে মার্জনা করে দেয় মনে মনে।

সাইকেল হল ছেলেদের কাছে স্বর্গ। ব্যাক্সীট্ থেকেই ক্রমশঃ স্বর্গারোহণ,—পা-দানী থেকেই পাল্লা সুরু বলতে গেলে। ব্যাকে চেপেই সাইকেলে আসলচাপার পথ পরিষ্কার করতে হয়। সাইকেলের ব্যাক্সীট্কে উপসর্গ বলা যেতে পারে, সুতরাং।

প্রথমে ঈষৎ ভদ্রয়ানার ভান, পরে অর্দ্ধ-অনিচ্ছা, তার পরে একটু দোমনা দেখিয়ে টুনু রাজী হয় অবশেষে।

টুনুর বাড়ী কোন্ রাস্তায় এবং কত নম্বরে জেনে নেন ভদ্রলোক। তারপর বলেন—যদি "একটু এধার দিয়ে ঘুরে যাই, তোমার খুব অসুবিধা হবে কি? একট কিন্তু ঘুর হবে তা'তে। কিছু দেরীও হয়ে যেতে পারে তোমার।"

হোক্ গে, টুনুর কোনো আপত্তি নেই। আরো তো ভালো তার, আরো বরং বেশীক্ষণ সাইকেলের স্বর্গ সে উপভোগ করবে।

নিজে থেকেই বলতে থাকেন ভদ্রলোক ঃ

—"আমার নাম? বোগেশ দা'। বোগেশ দা' বলেই ডেকো আমায় তুমি।"

একটু থেমেই যোগ করেন আবার ঃ "বোগেশ মনে থাকে যেন। বোগাস্ নয় কিন্তু।"

দুটো শব্দের সাদৃশ্যে মনে মনে হাসে টুনু। বোগাস্ দা'! খাসা নাম! মনে মনেই বলে সে।

"বাপ মা নাম রেখেছিল বোগেশ! আমি কি করব বলো? মানে হয় না। কিন্তু ফেলতেও পারা যায় না। আবার এমন গোলমাল হয় এক-এক সময়ে—বোগাস্ আর বোগেশে!"

টুনু এবার হেসেই ফেলে। সশব্দেই। ভদ্রলোক একটু মুষড়ে পড়েন যেন।

টুনু লজ্জিত হয়ে যায়।

সাইকেল চলতে থাকে। তাদের বাড়ীর রাস্তা বাঁ-হাতি রেখে তে-মাথার সিনেমাকে ডানধারে ফেলে, তাদের পাড়া ছাড়িয়ে, অনেক দুর ঘুরে তার অজানা অচেনা সব গলিঘুঁজি দিয়ে তারা চলতে থাকে। টুনু ক্রমশঃ অসুবিধা বোধ করে যেন। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে দেরী হলে আবার বকুনি আছে ঠাকুমার! অথচ ভদ্রলোক নিজের থেকে নিয়ে চলেছেন, কিছু বলাও যায় না।

কিন্তু সাইকেলের ব্যাকে বসে টুনু নিতান্তই অসহায়। সাইকেলের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আছাড় খেতে অনেক লোককে সে দেখেছে অনেকবার,—কিন্তু স্বর্গ থেকে পতন সম্ভব হলেও, সে ভেবে এবং আলোচনা করে দেখে উপসর্গ থেকে পতন অত সহজ নয়। পর-চালিত সাইকেলে বসে কি করে ও আছাড় খাবে বল।

তাকে যেতেই হবে, নিরীহের মতই বসে-বসে যেতে হবে, সাইকেল-চালকের যদৃচ্ছাক্রমে এবং যেখানে খুসী। সাইকেলে চাপার সুযোগ না নিলেই সে ভালো করত, এখন তার মনে হতে থাকে।

অবশেষে সাইকেল থামে এক জায়গায় এসে।

"এই আমার বাড়ী।" বোগেশ দা' বলেন,—"ভাড়াটে বাড়ীই অবশ্যি; আর এখানেই আমাদের বয়েজ্ স্পোর্টিং ক্লাব্, এরই নীচের তালায়। এস ভেতরে, দেখবে এস।"

ভাববার অবকাশ পায় না টুনু। বাড়ী ফিরে বকুনির কথাও ভুলে যায়। যন্ত্র-চালিতের মতই সে বাড়ীর মধ্যে ঢোকে।

সত্যিই, দেখবার মত বটে ক্লাব্টা। তিন-চারটে ঘর জুড়ে। সামনের আর পাশের ঘরে, প্রায় তারই সমবয়সী ছেলেরা ক্যারম্ আর পিং-পং খেলছিল। এতক্ষণে একটু উৎসাহ বোধ হতে থাকে টুনুর।

ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক চোট খেলে গেলেও হয়। পারবে ওরা ওর সঙ্গে? হুঁ, তা আর পারতে হয় না! পর পর নিলে-গেম্ খাইয়ে দেবে টুনু।

"আচ্ছা, আচ্ছা, খেলবে পরে।" বোগেশ দা' যেন টুনুর মনের কথা টের পান—"তুমি তো আজ থেকেই মেম্বার হয়ে গেলে আমাদের ক্লাবের। চাঁদা? এখন সঙ্গে নেই বলছ? আচ্ছা সে কাল বিকেলে দিয়ো 'খন এনে। এখন এস, কত শীল্ড্ কাপ্ আর ট্রফি আমরা জিতেছি দেখবে চল। সে সব ওপরে সাজানো আছে আমার ঘরে।"

ওপরে যায় টুনু।

টুনুর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়—মানে, যত দূর পর্যন্ত হবার।

বাবাঃ! কতগুলো শীল্ড্ আর কাপ্! তাদের চকমকানিতে ঘর যেন ঝক্মক্ করছে।

বোগেস দা'র মুখ চল্তে থাকে, "ঐ কাপ্টা কিসে পেয়েছিলুম জান? বক্সিং-এ! বলাই চাটুজ্যেকে হারিয়ে। অবাক্ হচ্ছ? বলাই চাটুজ্যেকে হারানো যায় না বুঝি? নাই যদি হারালুম তা হ'লে কাপ্টা পেলুম কি করে? তুমিই বল। আর এই যে ট্রফি দেখ্ছ—এটা

যুযুৎসুর জন্য। যুযুৎসুর অনেক প্যাঁচ আমি জানি। তোমাকেও শিখিয়ে দেব। এক সময়ে শিখে নিয়ো। এই ব্যাট্‌টা দেখেছ তো! কেমন ব্যাট্‌ দেখ। এই দিয়ে তিন হাজার রান্‌ তুলেছি আমি, তার মধ্যে সতেরটা সেঞ্চুরি আর চারটে ডবল সেঞ্চুরি! আর ঐ কাপ্‌টা টেনিস্‌-এর জন্যই, সাউথ্‌ ক্লাব থেকে পাওয়া—নেতাজীর বাড়ীর কাছে সাউথ্‌ ক্লাব। ফ্রেঞ্চ্‌ টেনিসিয়ান্‌ কোশেকে হারিযে পেয়েছিলাম। কোশে। কোশের নাম শোনো নি! শুনবেই বা কি করে? খুব ক'ষে হারিয়ে দিয়েছিলুম তাকে! আর পাতিয়ালার কুস্তিগির লটপট্‌ সিংকে হারিয়ে পেয়েছিলাম এই রূপোর কাস্‌কেট্‌। তোমার কি মনে হয়, রূপো নয় এ? নিছক কাঁসা? পাগল! পাতিয়ালার মহারাজা নিজে হাতে তুলে আমাকে প্রেজেণ্ট্‌ করলেন, আর তিনি কিনা কাঁসা ছোঁবেন? বল কি! এ কখনও হতে পারে? আর ঐ ভারী শীল্ড্‌টা দেখছ? ওটা একটা ফুটবল টুর্ণামেণ্ট জেতার। আমি যে এক সময়ে মোহনবাগানে খেলেছি হে! কদ্দিন ক্যাপ্টেন্‌ ছিলাম মোহনবাগানের! গোলেও খেলতাম, হাফ্‌ ব্যাকেও, ব্যাকেও। যাকে বলে অল্‌রাউণ্ড প্লেয়ার—মানে, চারিধারে গোল। এই যে আমার নাকটা একটু বাঁকা, কেন বল দেখি? একবার নাক দিয়েই বল আটকে গোল বাঁচিয়ে দিলুম কিনা! সেই থেকেই। কি করি, তীরবেগে বল আসছে, হাত-পা দিয়ে ঠেকানো যায় না, হেড্‌ ক'রেও না; নাকই ছিল হাতের কাছে, নাকিয়ে বলটাকে বাঁকিয়ে দিলাম। একেবারে যাকে বলে নোক্‌ড্‌ আউট্‌। কর্ণার হল বটে, কিন্তু গোল তো বাঁচল! সেই টুর্ণামেণ্ট জেতারই তো ঐ শীল্ড্‌। কিন্তু নাকটাও আমার গেল বেঁকে। যাক্‌ গে—!"

টুনু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বোগেশ দা এবং নাক—তুজনের দিকেই। মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে। সব রকম স্পোর্টসে সমান ফ্রীকস্‌—বোগেশ দা তো কম নন্‌! ভক্তির উচ্ছ্বাসে উথলে ওঠে টুনু। সাক্ষাৎ দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনে হতে থাকে ওর।

—"আর ঐ সব টুক্‌রো-টাক্‌রা মেডেল, কাপের তো ইয়ত্তাই নেই। ও-সব পেয়েছি ক্যারাম্, ব্যাডমিণ্টন্, বাগাডেল, পিং-পং, দাবা-বোড়ে এই সব কম্পিটিশন জিতে—'

তারপর তিন মাস কেটে গেছে। টুনু এখন বয়েজ স্পোর্টিং-এর নাম-করা মেম্বার। সে নিজেও অনেককে দলে টেনেছে—তার অনেক বন্ধুকেই। তাদের ক্লাব্ এখন চলছে জোর। এই ফুটবলের মরশুমে তারা নিজেরাও একটা টুর্ণামেন্ট খুলবে স্থির করছে। টুনু তার ঠাকুমাকে বলে-কয়ে টাকা দেয়াতে রাজী করিয়েছে। স্বর্গগত ঠাকুরদা'র নামেই, ক্লাব থেকে একটা কাপ্ আর এগারোটা মেডেল ঘোষণা করা হবে। একধারে ঠাকুরদা'কে অমর করা আর নিজেরা খেলে অমর হওয়ার এমন ফুটবল-যোগ কিছুতেই পা-ছাড়া করা যায়না।

কিন্তু এই ঘোষণার মুখেই গোলবাধল। বোগেশ দা একদিন তাঁর মুখ চুণ ক'রে এসে হাজির। কোথায় নাকি কিছু টাকা ধার করা ছিল তাঁর, না শুধতে পারায় পাওনাদাররা এসে তাঁর যত শীল্ড্ আর কাপ, মেডেল আর অন্যান্য ট্রফি—এমন কি পাতিয়ালা-প্রদত্ত সেই সন্দেহজনক রূপোর বাস্কেট্‌টি পর্য্যন্ত ক্রোক করে নিয়ে গেছে। সেগুলো উদ্ধার না করলে নয়। তা না হলে ক্লাবই ভেঙে যায়, টুর্ণামেন্ট তো টুর্ণামেন্ট!

এবং উদ্ধার করতে হবে টুনুকেই। টুনু ছাড়া কে করবে আর? কিন্তু টুনু—? সে ভারি অবাক্ হয়। তখন তার কানে কানে একটা উপায় বাৎলে দেন বোগেশ দা'। টুনু ঘাড় নাড়ে, বলে, "না না, সে হয় না" বোগেশ দা' আরো বেশী ঘাড় নাড়েন। অবশেষে টুনুর ঘাড় নাড়ার ক্ষমতা লোপ পায়।

বোগেশ দা' বলে দেন—"মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ৪৪০ নম্বর ষ্টল, মনে থাকবে তো? কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় যাব আমি। ঠিক যাওয়া চাই কিন্তু তোমার। ঐ নিয়ে—বুঝেচ?"

টুনু ফাইনাল ভোট দেয়, এবার নিজের বিরুদ্ধেই।

অনেক এদিক্ ওদিক্ ক'রে, বহুৎ ইতস্ততর পর, শেষাশেষি মরিয়া হয়ে ওঠে টুনু। ঠাকুমার পূজোর ঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে হাত পূরে নেয়। যা পায় আঙ্গুলের ফাঁকে তুলে নিতে সে দ্বিধা করে না। তার পর সোজা ছুট মারে মার্কেটের দিকে।

তখনও বারোটা বাজতে আধ ঘণ্টা দেরী, গীর্জ্জার ঘড়িতে সে দেখতে পায়। যাক্, ষ্টলটা ততক্ষণে চিনেই আসা যাক্ না কেন!

৪৪০ নম্বরের ষ্টল। সেখানে এসে ঝলসে যায় টুনুর চোখ। সমস্ত ষ্টল বোঝাই যত শীল্ড্ আর কাপ্, মেডেল আর কত কী! এবং কাস্কেটও অগুণ্তি। রূপো কি কাঁসার ওগুলো, কে জানে!

টুনু অবাক্ হয়ে ভাবে, আজ কি যত রাজ্যের যত স্পোর্টস্‌ম্যান্, সবার সম্পত্তিই এক সঙ্গে নীলাম হতে চলেছে? বড় সমস্যার ব্যাপার তো তাহলে!

যোগেশ দা'র জিনিষগুলোও সে চিনতে পারে—দেখবা মাত্রই। কত দিন নির্ণিমেষে ওর দেখা ওগুলো। ভুল হবার যো কি? ঐ যে ওই কোণে সব থরে থরে সাজানো রয়েছে।

সাহসী হয়ে ষ্টল-কীপারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে টুনু, "এত সব শীল্ড্, কাপ্ এখানে কেন?"

"আমরাই তো সাপ্লাই করি স্পোর্টস্‌ম্যান্‌দের। প্রায় যত পাড়াটে ক্লাব সব আমাদের ভাড়াটে। অর্ডার দিয়ে দিয়ে ডিজাইন-মাফিক তৈরী করানো এ সব। এ সব না হলে কি ক্লাব চলে আজকাল? মেম্বার আসবে কেন? ছেলেরা কি এতই বোকা নাকি? কলকাতার ছেলে! সহজে ভোলবার ছেলে নয় এরা।" ষ্টল-কীপার মুখখানা একেবারে হাঁড়ি-পানা করে আনে।

টুনুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন।

"যোগেশ দা'—যোগেশ দা' কখন আসবেন বল্‌তে পারেন?"

"কে ? স্পোর্টস্‌ম্যান্ মিষ্টার বোগেশ দাস ? তাঁর অপেক্ষাতেই তো বসে আছি খোকা ! তাঁর কে এক বন্ধু নাকি টাকা নিয়ে আসছেন। হ্যাঁ, টাকা আজকাল সস্তা হয়েছে কিনা ! বল্লেই চলে আসে অম্‌নি !—"

তারপর টুনুকে আপ্যায়িত করার জন্যই যেন সহানুভূতির সুরে সুরু করেন—"আমরা অনেক সুবিধা দিয়েছিলাম ভদ্রলোককে—যাতে ক্লাবটা চালু হয়। তা, দু'-তিন মাস হয় তো হয়, একেবারে ন'-ন' মাসের ভাড়া বাকি ! তা হলে কি করে চলে বল ? এই থেকেই তো চালাতে হয় আমাদেরও।"

টুনু জিজ্ঞাসা করে—"ন' মাসের বাকি ? কিসের ভাড়া মশাই ? আপনাদের বাড়ী নাকি সেটা, বোগেশ দা' যেখানে থাকেন ?"

"বাড়ী ভাড়া না হে ছোকরা, বাড়ী না। আমরা ষ্টল-কীপার, কারো ঘর-বাড়ীর খবরে কী দরকার আমাদের। বাড়ীভাড়াও বাকী ফেলেছে কিনা কে তার খবর নিতে গেছে ? সময়ই বা কই ? আর এমন গরজই বা কি আমাদের ? বাড়ী নয়, আমাদের এই শীল্ড্-কাপ্-মেডেলের বাকী ভাড়ার কথাই বলছি।"

"য়্যাঁ ?" টুনু আপাদমস্তক চম্‌কে ওঠে। "এ সব কি তবে ভাড়া করা ছিল নাকি ?"

কেবল প্রথম শব্দটাই টুনুর মুখ থেকে বেরোয়, বাকিগুলো তার মনে মনেই উচ্চারিত হয়।

বারোটার দুটো কাঁটা এক হতে-না-হ'তেই টুনু সরে পড়ে সেখান থেকে। ঊর্দ্ধশ্বাসে সে বাড়ী ফেরে।

এবং ফিরে লক্ষ্মীর সম্পত্তিও লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে রেখে আসে আবার।

টুনু ভাবতে বসে তার পর। মুখখানা তার কেমন এক রকম হয়ে যায়—সেটা চিন্তাশীলতার লক্ষণ।

বোগেশ দা'র নামটা কি সত্যিই খুব গোলমেলে ?

নিজেকেই প্রশ্ন করে টুনু।

ঘোড়াও ঘোড়েল হয়

একবার হাতী পোষার বাতিক হয়েছিল আমার কাকার। সেই হাতীর সঙ্গেই একদিন তাঁর হাতাহাতি হয়ে গেল। হাতীর শুঁড় কাকার কান থেকে খুব বেশী দূর ছিল না—সুতরাং তার আসন্ন ফল কী দাঁড়াবে তা আমি এবং হাতী দু'জনেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। কাকাও যে পারেন নি তা নয়, কিন্তু দুর্ঘটনা আর বলে কাকে! সেই কর্ণবিধ-পর্ব থেকে এই গল্পের সুরু।

কান গেলে মানুষের যা দুঃখ, অনেক সময়ে প্রাণ গেলেও ততটা হয় না। কান হারিয়ে কাকা ভারি মুষড়ে পড়েছিলেন, দিনকতক। আশ্চর্য কিছু নয়! কর্ণহীন হলে অমন অনেকেই মুষড়ে পড়ে।

কর্ণের বিপদ পদে পদে, এই কথাটাই কাকাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি। মহাভারত পড়েও জানা যায়, তা ছাড়া পাঠশালায় পড়বার সময়ও আমি এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। হাড়ে-হাড়ে না বলে কানেকানে বললেই ঠিক হবে, কেননা কানের মধ্যে বোধ হয় হাড় নেই, থাকলে ওটা অত সুখকর 'মলতব্য' ব্যাপার হত না।

কাকাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কাকা বোঝেন কিনা তিনিই জানেন। তত্ত্বকথা বোঝা সহজ কথা নয়। আর তা ছাড়া আমি তাঁকে বোঝাই মনে মনে, মুখ ফুটে কিছু বলার আমার সাহস হয় না। কাকা যা বদ্‌রাগী!

কাকাকে দেখলে আজকাল আমার ভয় হয়। কর্ণচ্যুত কাকা পদচ্যুত চেয়ারের চেয়েও ভয়াবহ। তার উপর নির্ভর করা যায় না—করেছ কি কুপোকাৎ! আর আজকাল যে রকম কট্‌মট্ করে তিনি

আমার দিকে তাকান ! আমার মুখের পানে বড় একটা না, কেবল কানের দিকে। ঐ দিকেই তাঁর যত চোখ, যত ঝোঁক্ আর যত রোখ্। আমি বেশ বুঝতে পারি আমার কর্ণসম্পদে তিনি ঈর্ষান্বিত। হাতীর হাত থেকে বাঁচিয়েছি, এখন কাকার কবল থেকে কি ক'রে কান সামলাই সেই আমার এক সমস্যা। কাকা একবার ক্ষেপে গেলে আমাকে নিজের দশায় আনতে তাঁর কতক্ষণ ?

তাই আমিও যতটা সম্ভব, দূরে থাকার চেষ্টা করি। নিতান্ত কাকার কাছাকাছি থাক্‌তে হলে মর্মাহত হয়েই থাকি। এবং মনে মনেই তাকে সান্ত্বনা দিই।

অবশেষে একদিন সকালে কাকা অকস্মাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। "শিবু - শিবে !" আমার ডাক পড়ে।

কাকার কাছে দৌড়োই, কান হাত ক'রে। এত যখন হাঁক-ডাক, কী সর্বনাশ হয় কে জানে ! প্রাণে মরতে ভয় খাই না, কিন্তু কানে মারা যাবার ভয় আমার বড্ড।

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? হয়েছে, সব ঠিক হয়েছে। আর ভাবনা নেই !" উৎসাহের আতিশয্যে কাকা উথলে ওঠেন। আমি চুপ ক'রে থাকি।

"বুঝেছিস্ কিছু ?" কাকার প্রশ্ন হয়।

"উহুঁ—" আমি হু' কান নাড়ি। ঘাড় নাড়লেই কান নড়ে যায়, আমি বরাবর দেখে আসছি।

"রামপুরহাট যাব। টিকেট্ কিনে আন্ গে'। একটা ফুল, একটা হাফ। তুইও যাবি আমার সঙ্গে।"

"রামপুরহাট ?—হঠাৎ ?" আমি বলে ফেলি।

"হঠাৎ আবার কি? সেইখানেই তো যেতে হবে।" আমার বিস্ময়কর প্রশ্নে কাকা যেন হতভম্ব হয়ে যান। "বামাক্ষ্যাপার জীবনী পড়িস্ নি ? আর পড়বিই বা কী করে ! বুড়ো ধাড়ি হতে চল্লি, কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা হল না তোর ! যত বলি সাধুমহাত্মা যোগী-ঋষিদের জীবনী

পড়্—তা না, কেবল ডাণ্ডাগুলি, লাট্টু আর লাটাই! যদি পড়তিস্ তা হ'লে আর জিজ্ঞাসা করতিস্ না ''

আমি আর জিজ্ঞাসা করি না। মৌন দ্বারা কেবল সম্মতি নয়, পাণ্ডিত্যেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়, 'যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে' এই শিক্ষাটা হয়ে আছে। আমার আর কথা বলে কোন্ হাঁদা? কাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমাকে জ্ঞান দান করতে উদ্যত হন।

"রামপুরহাটের কাছেই এক মহাশ্মশান আছে, জানিস্? এই দশ-বিশ মাইলের মধ্যেই। সেই শ্মশানে ব'সে কেউ যদি একটানা তিন লক্ষ বার কোনো দেবতার নাম জপ কর্‌তে পারে তা হ'লেই নির্ঘাৎ সিদ্ধি। স্বয়ং বশিষ্ঠ মুনি বর দিয়ে গেছেন। আমার ঠাকুর্দার মুখে শোনা। সেখানেই যাব আমি।"

"সেখানে কেন কাকা?" আমি একটু বিস্মিতই হই। সিদ্ধির জন্য অত কষ্ট করে অত দূর যাবার কী দরকার? রামপুরহাট না গিয়ে, রামশরণ দুবেকে বললে এখুনি তো দু বাটি বানিয়ে এনে দেয়? কোনও হাঙ্গাম নেই। হ্যাঁ, সব তাতেই কাকার বারাবাড়ি!

আমার সিদ্ধি-মেড্-ঈজির ভূমিকা পাড়বার মুখেই কাকা উস্‌কে ওঠেন—"উহুঁ-হুঁ, সে সিদ্ধি নয়। ও তো খেতে হয়, খেলে আবার মাথা ঘোরে। এ সিদ্ধি পেতে হয়, বামাক্ষ্যাপা, বারদির ব্রহ্মচারী এঁরা সব ঐ শ্মশানে ব'সে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ব্যাপারটা কি রকম জানিস? আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা এই রকম জপ ক'রে যাব, যেম্‌নি তিন লক্ষ বার পূরবে অমনি মা দুর্গা হাসতে হাসতে দশ হাত নেড়ে এসে হাজির হবেন। তাঁর ছেলে সিদ্ধিদাতা গণেশও আসবেন শুঁড় নাড়তে নাড়তে। দুজনেই এসে বলবেন—'বৎস, বর নাও'—"

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠি।

"তখন আমি যা বর চাইব, বুঝেছিস্ কিনা, সঙ্গে সঙ্গে ফলবে। তাকেই বলে সিদ্ধিলাভ। যদি আমি চাই, চাই কি, আমার আরো দুটো হাত গজাতে পারে। হুম্! তৎক্ষণাৎ!"

শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়। চতুর্ভুজ কাকার দৃশ্যআমি কল্পনা করি।

"কিন্তু আমি তো আর হাত চাইব না। হাত তো আমার আছেই। দুটো হাতই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই নিয়েই পেরে উঠি না! তার পর চারটে হাত হলে পাশ ফিরে শোব কি করে? পায়েরও আমার আর দরকার নেই। দুটো পা-ই আমার মোর্ দ্যান্ এনাফ্। আমি কেবল চাইব আর একটা কান। কান না হ'লে আমাকে মানায় না, আয়নার দিকে তাকানোই যায় না। তাই বুঝেছিস কিনা, অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম রামপুরহাট! মন্ত্রবলে চারটে হাত কি চারটে পা যদি আমার গজাতে পারে তা হ'লে একটা মাত্র কান গজানো আর এমন কি?"

আমারও দারুণ বিশ্বাস হয়ে যায়। মন্ত্রবলে কত কি হয় শুনেছি, কান হওয়া আর কী কঠিন? কানেই যখন মন্ত্র দেয়, তখন মন্ত্রেও কান দিতে পারে। আশ্চর্য কিছু নয়। তিন লাখ বার কেবল দুর্গা কি কালী কি জগদ্ধাত্রী—এর যে কোন একটা নাম—উঁহুঁ, জগদ্ধাত্রী বাদ, —চার অক্ষরের মন্ত্র, ভেতর মধ্যে আবার দস্তুরমত দ্বিতীয় ভাগ—জগদ্ধাত্রীর তিন লক্ষ মানে দুর্গার ছ লাখের ধাক্কা। অনর্থক শক্তির বরবাদ আর সময়ের অপচয়! পয়সা না লাগুক, কিন্তু দেবতার নামের বাজে খরচ করতেও আমি রাজি নই।

"কাকা, আমিও তা হ'লে বর চেয়ে নেব, যাতে না পড়ে শুনে ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারি।" আমি একটু ভেবে নিই, "কেবল পাশ করাই বা কেন, স্কলারশিপ্‌টা নিতেই বা ক্ষতি কি? যে-বরে পাশ হয়, স্কলারশিপ্‌ও তাতেই হতে পারে, কি বল কাকা? মা দুর্গার পক্ষে কি খুব শক্ত হবে তেমন, তুমি মনে করো?"

"বাঃ-রে! আমি মরব জপ ক'রে আর তুমি পাশ করবে না পড়ে? বাঃ-রে!"—কাকা খাপ্পা হয়ে ওঠেন।

"তা হলে আমার গিয়ে আর কী হবে?" আমি ক্ষুণ্ণ হই। "তোমার সঙ্গে তবে নাই বা গেলাম, আমার তো কানের তেমন অভাব নেই।"

"পাগল! তা কি হয়? তোকে যেতেই হবে। সিদ্ধিলাভ করা কি অতই সোজা? জপ কর্‌তে বস্‌লেই তুলে দেয় যে—"

"কে? পুলিসে?"

"উঁহুঁ। পুলিস সেখানে কোথায়? শুনছিস্ মহাশ্মশান! বারো ক্রোশের মধ্যে জনমনিষ্যি নেই।"

"ও, বুঝেছি। শেয়াল! বেশ, তোমার বন্দুকটা নিয়ে যাব—কাছে এলেই দুম্!"

"শেয়াল নয় রে পাগ্‌লা, শেয়াল নয়। ডাকিনী-যোগিনী, ভূত-প্রেত, তাল-বেতাল—এরা এসে তুলে দেয়। সিদ্ধিলাভ করতে দেয় না।"

ভূত-প্রেত শুনেই আমি গেছি। তাল-বেতালের তাল আমাকেই সামলাতে হবে ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হয়। "কাকা—কাকা—" কম্পিত কণ্ঠ থেকে কেবল কা কা-ধ্বনি বেরোয়, আর কিছু বেরোয় না।

"আরে, তোর ভয় কিসের। আমি তো কাছেই থাক্‌ব। গতিক সুবিধের নয় দেখ্‌লে দুর্গা পালটে রাম নাম জপতে লেগে যাব না হয়। রাম নামে ভূত পালায়। তবে রাম হচ্ছে খোট্টাদের দেবতা—তা হোক গে, রামও বর দিতে পারেন। সীতা উদ্ধার করেছিলেন আর একটা কান উদ্ধার করতে পারবেন না? তবে কিনা, দুর্গা—দুর্গাই হ'ল গিয়ে মোক্ষম্! রামকেও দুর্গার কাছে বর নিতে হয়েছিল।"

তথাপি আমি ইতস্ততঃ করতে থাকি।

"আচ্ছা এক কাজ করা যাক। তুই-ই না হয় রাম নাম জপিস্—তা হ'লে তো তোর আর ভয় নেই! রামকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাশের ফিকিরও করে নিতে পারিস! আমার কোন আপত্তি নেই। ভোলানো খুব শক্ত হবে না হয়ত। রামটা ভ্যাবা গঙ্গারাম! তা না হ'লে বাঁদরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, এত মানুষ থাকতে?" এখানে এসে কাকাকে দম্ নিতে হয়—"তা ছাড়া, দাঁতব্যথা, পেট কামড়ানো সর্দি-

কাশি, লঙ্কা খেলে হেচ্‌কি ওঠা—স্কুলের টাস্ক না হলে ডায়েরিয়া হওয়া—তোর যত ব্যায়রাম লেগেই তো আছে! সব সেরে যাবে রামের মহিমায়।'

পাশের কথায় আমার উৎসাহ সঞ্চার হয়। নতুন প্রস্তাবে কাকার সঙ্গে রফা ক'রে ফেলতে দেরী হয় না আমার। সেই দিনই আমরা রওনা হই; সন্ধ্যার মুখেই রামপুরহাটে পৌঁছানো; কাকার বন্ধু এক ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে আমাদের আবির্ভাব।

ডাক্তার ভদ্রলোক সে সময়ে এক ঘোড়ার দর করছিলেন। একজন গেঁয়ো লোক ঘোড়া বেচতে এসেছিল, দিব্যি খাসা ঘোড়াটি—আকার-প্রকারে তেজী বলেই সন্দেহ হয়।

প্রাথমিক কুশল-প্রশ্ন আদান-প্রদানের পরই কাকা জিজ্ঞাসা করেন—"ঘোড়া কেন হে হারাধন?"

"আর বল কেন বন্ধু!" হারাধন-ডাক্তার দুঃখ প্রকাশ করেন, "দূর দূর সব গ্রাম থেকে ডাক আসে, সেখানে তো মোটর চলে না, গোরুর গাড়ীর রাস্তাও নেই অনেক জায়গায়,—সেস্থলে ঘোড়াই একমাত্র বাহন।" অদূর-স্থিত সাইকেলের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে—"ওতে চেপে আর পোষায় না ভাই! হার্ণিয়া হয়ে যাবার যোগাড়! তাই দেখে শুনে একটা ঘোড়াই কিনছি।"

"বেশ করছ, বেশ করছ।" কাকা অন্তর থেকে ওঁকে সমর্থন করেন—"স্বদেশী ঘোড়া থাকতে বিদেশী সাইকেল কেন হে। ঠিকই বুঝেছ এতদিনে! তা, তোমার ঘোড়াটিকে বেশ শান্তশিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে যেন।" কাছে গিয়ে কাকা ঘোড়ার পিঠ চাপ্‌ড়ে সার্টিফিকেট্‌ দেন।

"তোমার তো ছোটবেলায় ঘোড়ায় চাপার বাতিক ছিল হে! ঘোড়া দেখলেই চেপে বসতে।" ডাক্তার বলেন, "কি রকম জানোয়ার কিনলাম, একবার চড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখবে না? আমার তো ঘোড়ায় চাপা প্র্যাকটিস্‌ করতেই যাবে এখন কিছুদিন!"

তৎক্ষণাৎ অশ্ব-পরীক্ষায় সম্মত হন কাকা। হাতী-ঘোড়ার ব্যাপারে বেশী বেগ পেতে হয় না রাজী করতে কাকাকে। চতুষ্পদের দিকে কাকার স্বভাবতঃই টান। সে তুলনায় আমার দিকেই একটু কম বরং, পদগর্ব করবার মত কিছু আমার নেই বলেই বোধ হয়।

"ঘোড়ায় চাপবার বয়েস কি আছে আর?" কাকা সন্দিগ্ধ সুরেই বলেন, "দেখি তবু চেষ্টা করে!" তার পর ডাক্তার বাবু, আমি এবং অশ্ব-বিক্রেতা—সর্বোপরি স্বয়ং অশ্বের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় কষ্টে-সৃষ্টে কোন রকমে তো চেপে বসেন।

কাকার দেহখানি তো কম নয়, ভারাক্রান্ত হয়ে ঘোড়াটা কেমন যেন ভড়কে যায়। নড়বার নামটিও করে না। কাকা যতই "হেট্ হেট্" করেন ততই সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে থাকে।

অশ্ব-বিক্রয়ের আশা ক্রমশঃই সুদূরপরাহত হচ্ছে দেখে অশ্ব-বিক্রেতা বিচলিত হয়ে ওঠে; এবং তার হাতের ছিপ্‌টিও। কিন্তু যেই না ঘোড়ার পিঠে সপাৎ ক'রে এক ঘা বসিয়ে দেওয়া, অম্‌নি ঘোড়াটা ঘুরপাক খেতে সুরু ক'রে দেয়। এ আবার কী কাণ্ড! কাকা তো 'মরিয়া হয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরেন।

এদিকে, ঘোড়ার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে ডাক্তার বাবুর সখের বাগানের দফা রফা! নানাপ্রকার গোলাপ গাছের চারা লাগিয়েছিলেন, ঘোড়া কেনবার কাছাকাছিই লাগিয়েছিলেন—ঘোড়ার পায়ে তাদের অপমৃত্যুর আশঙ্কা তো করেন নি কোন দিন! অতঃপর অশ্ববর মুহুর্মুহু এগোতে আর পেছোতে থাকে, যে পথে এগোয় সে পথে প্রায়শই পেছয় না—এবং এই বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্র অগ্র-পশ্চাৎ গতির ধাক্কায় আর এক ধারের সব শাক-সব্জীর দফা সারে। কিন্তু এ সমস্তই কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার! আশ্চর্য ব্যস্ততার মধ্যে পর পর এই দুটি মহাদেশ বিধ্বস্ত ক'রে অশ্ববর এক নিদারুণ লাফ মারেনএবং সেই এক লাফেই, কাকা-পৃষ্ঠে, বাগানের বেড়া টপ্‌কে সামনের একটা নালা ডিঙিয়ে, তাঁকে অন্তর্হিত হতে দেখা যায়।

আমিও দেরী করি না, তৎক্ষণাৎ সাইকেলটায় চেপে পশ্চাদ্ধাবন করি। ঘোড়ার এবং কাকার।

ধাবমান অশ্বকে সশরীরে খুব সামান্যই দেখা যায়, অল্পক্ষণ পরেই তিনি শুধু শ্রুতিগোচর হতে থাকেন। দূর থেকে খটাখট্ কানে আসে; কিছুক্ষণ পরে পদধ্বনিও না—কেবল চিঁহি শোনা যায়। তখন সেই চিঁহি চিঁহি চিঁহিরই অনুসরণ করি।

অনেকক্ষণ অনেক ঘোরাঘুরির পর এক 'ধু-ধু' প্রান্তরে এসে পড়ি। সন্ধ্যা কখন পেরিয়ে গেছে, আধখানা চাঁদের ম্রিয়মান আলোয় কোন রকমে সাইকেল চালিয়ে চলি। কিন্তু সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও চিহ্নমাত্র নেই—না ঘোড়ার না সওয়ারের।

ইতস্ততঃ সাইকেল চালাতে থাকি! কী আর করব? ফাঁকা মাঠ আর পরের সাইকেল পেলে কে ছাড়ে? কাকা-হারা হয়ে বাড়ী ফিরে কাকীর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব? সে ভাবনাও যে একেবারেই নেই তা নয়।

"কে রে? শিবু নাকি? শিবুই তো!"

চম্‌কে গিয়ে সাইকেল থামাই। দেখি কাকা এক উঁচু ঢিবির পাশে পা ছাড়িয়ে পড়ে আছেন।

"আঃ, এসেছিস তুই? বাঁচলুম।"

"তোমার ঘোড়া কোথায় কাকা?"

"আমাকে ফেলে পালিয়েছে। কোথায় পালিয়েছে কে জানে!" কাকার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে—"আঃ, হতভাগার পিঠ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচেছি। কিন্তু এ কোথায় এনে ফেলেছে? এও কি রামপুরহাট?"

"উঁহু, মনে তো হয় না। রামপুরহাট কত মাইল দূরে বলতে পারব না, তবে বেশ কয়েক ঘণ্টা দূরে।"

"তা হ'লে এ কোন্ জায়গা? তুই কি বল্‌ছিস্ তবে লক্ষ্মণপুরহাট?"

"লক্ষ্মণপুর হতে পারে হনুমানপুর হ'তে পারে, কিন্তু হাটের

কোনো লক্ষণ নেই কাকা! চারধারেই তো সাইকেল ক'রে ঘুরলাম, জনমানবের পাত্তাই নেই কোথাও।"

"তবে—তবে এই কি সেই মহাশ্মশান?" কাকা নিজেই নিজের জবাব দেন, "দুর্লক্ষণ দেখে তাই তো মনে হয়। দম্‌কা হাওয়ায় মড়া পোড়ানোর গন্ধও পেয়েছি খানিক আগে। দু' একটা শেয়ালকেও যেতে দেখলাম যেন। তা হ'লে—তা হ'লে কা হবে?" কাকার কণ্ঠে অসহায়তার সুর।

কাকার বিচলিত হওয়ার কারণ আমি বুঝি না।—"কেন? এখানে আসবার জন্যই তো আমাদের আসা? সিদ্ধিলাভের ব্যাপারটা এখন সুরু ক'রে দিলেই তো হয়!"

"আজই? আজ রাত্রেই? আজ যে সিদ্ধিলাভের জন্যে মোটেই আমি প্রস্তুত নই! আজ কি ক'রে হয়?"

"যখন হয়ে পড়েছে তখন আর কি করা?" আমি কাকার পাশে বসে পড়ি! "জায়গাটা ভালো, তত ঝোপ-ঝাড় নেই, বেশ ফাঁকা ফাঁকা—ভূতপ্রেত এলে টের পাওয়া যাবে।"

"সমস্ত দিন ট্রেনে—খাওয়া-দাওয়া হয় নি। খিদেয় নাড়ী চিঁ চিঁ করছে—এই কি সিদ্ধলাভের সময়? তোর কি আক্কেল রে শিবে? এ রকম বিপদ হবে জানলে কে আসতে চাইত—এই আমি নিজের কান মলছি, আজ যদি উদ্ধার পাই—"

কাকা অবশিষ্ট একমাত্র কানকে একমাত্রা মলে দেন। কিন্তু উদ্ধারের কোন ভরসাই পাওয়া যায় না। ততক্ষণে চাঁদ ডুবে গিয়ে অন্ধকার বেশ ঘোরালো হয়ে আসে—দু' হাত দূরেও দৃষ্টি অচল হয়।

আমি কাকার কাছে ঘেঁসে বসি, আমার গা ছম্‌ছম্ কব্‌তে থাকে।

অবশেষে কাকা বলেন—"তাই করা যাক্ অগত্যা। তোর কথাই শুনি। আজ রাত্রে এখান থেকে বেরুবার যখন কোন উপায়ই নেই তখন কি আর করা? কাল সকালে একেবারে সিদ্ধি পকেটে নিয়ে হারাধনের বাড়ী ফিরলেই হবে। এই নে আমার

কোট্—" কাকা একে একে আমার হাতে তুলে দিতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি খালি গা হচ্ছ কাকা?"

"বাঃ হব না? সাধু-সন্ন্যাসীরা কি কাপড়-জামা প'রে চাদর গায়ে দিয়ে তপস্যা করে নাকি? তা হ'লে কি সিদ্ধি হয় রে মুখ্যু? এই নে চাদর—এই নে আমার গেঞ্জি—এই নে আমার—"

আমি সচকিত হয়ে উঠি। অতঃপরবর্ত্তী বস্তুটি কি বুঝতে আমার বিলম্ব হয় না—"উঁহুঁ, কাপড়টা থাক্ কাকা। কাপড় পরাতে তত ক্ষতি হবে না—"

"তুই তো সব জানিস্" কাকা রাগান্বিত হন,—"হ্যাঁ কাপড়টা থাক্! তা হ'লেই আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে! তবে এত কাণ্ড করে দর্জি ডাকিয়ে গেরুয়া রঙের কৌপীনই বা তৈরী করালাম কেন, আর অত কষ্ট ক'রে এঁটে পরতেই বা গেলাম কেন?"

কাপড়ও আমার হাতে চলে আসে। সেই ঘুটঘুটি অন্ধকারের মধ্যে কৌপীনসম্বল কাকা কর্ণলাভের প্রত্যাশায় ঘোর তপস্যা সুরু করেন।

আমি আর কী করব? কাকার কাপড়টা মাটিতে বিছিয়ে পাতি, কোট্কে করি বালিশ, গেঞ্জিটাকে পাশবালিশ। তার পর আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে সটান্ হই। আমি দেখেছি, জেগে থাকলেই আমার যত ভয়, ঘুমিয়ে পড়লে আর আমার ভয় করে না।

অনেকক্ষণ অম্‌নি কাটে। ঘুমেরও কোনো সাড়া নেই, কাকারও কোনো সাড়া না। সহসা একটা আওয়াজ—চটাস্!

আমি চম্‌কে উঠি। কাঁপা-গলায় ডাকি—"কাকা!"

কাকার কোন জবাব নেই। আরো বেশী ক'রে আমি চাদর মুড়ি দিই।

আবার খানিক বাদে 'চটাস্'। এবার আওয়াজটা আরো জোরালো।

আবার আমার আর্তনাদ—"কাকা!"

অন্ধকার ভেদ ক'রে উত্তর আসে—"উঁহু হুঃ।"

কাকার চাপা হুঙ্কারে আমি নিস্তব্ধ হই। আর উচ্চবাচ্য করি না। কাকার যোগ ভঙ্গ ক'রে কি নিজের কানের বিঘ্ন ঘটাব? অন্ধকারের মধ্যেই ওঁর হাত বাড়াতে কতক্ষণ?

অনেক কাল কেটে যায়, আমার তন্দ্রার মত আসে। কিন্তু অকস্মাৎ চট্‌কা ভাঙে, চম্‌কে উঠে বসি, শুন্‌তে থাকি—চটাচট্ চচ্চড়্, চটাপট্ চচ্চড়্! অন্ধকারে চৌচির করে কেবল ঐ শব্দ, আর কিছু না, এবং বেশ জোর জোর।

তবে কি—তবে কি—? ভয়ে আমার হাত-পা গুটিয়ে আসে। তা হ'লে কি তাল-বেতালেই ধ'রে আমার কাকাকে পিট্‌তে সুরু করেছে? কিংবা, ভূতপ্রেতেই মজা ক'রে হাতের সুখ ক'রে নিচ্ছে? যাই হোক্, কোনটাই সুবিধের কথা নয়।

আমি 'মরিয়া' হয়ে ডাক্‌তে সুরু করি—"কাকা, কাকা, কাকা গো—!"

"বসতে দিচ্ছে না রে—"

আওয়াজ পেয়ে আশ্বাস পাই। তবু যা হোক্, আমার কাকান্ত ঘটে নি।—"ও-ও-ও কি-কি-কিসের শব্দ?" আমার গলা কাঁপে।

"আর বলিস না" করুণ কণ্ঠের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে দারুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস! 'বসতে দিচ্ছে না একদম।'

"কিসে বস্‌তে দিচ্ছে না? ভূতে?"

"উঁহু।"

"ডাকিনী-যোগিনী?"

" উঁহুহু।"

"তবে কি তাল-বেতাল?"

"নাঃ। মশায়। ভারী মশার উৎপাত।"

"ওঃ, তাই বল।" মশার কথা শুনে ভরসা পাই। তা হ'লে অন্য কিছু, মারাত্মক কিছু নয়। "তোমার চাদর মুড়ি দিয়ে ছিলাম

ব'লে বুঝতে পারি নি এতক্ষণ। তাই তো! কি রকম মশার ডাক, শুনছ কাকা,—পন্ পন্-পন্ পন্—! এরাই তোমার ডাকিনী নয় তো?"

"কে জানে!" কাকার বিরক্তির তীক্ষ্ণতায় অন্ধকার বিদীর্ণ হয়, "কিন্তু যোগিনী যে তা বিলক্ষণ টের পেয়েছি। গায়ের সঙ্গে যোগ হওয়া মাত্রই।"

আবার চট্‌পট্ সুরু হয়। মনের সুখে গালে মুখে হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে চড়াতে থাকেন কাকা। চপেটাঘাত ছাড়া মশকবধের অন্য উপায় কী আছে? অতঃপর কেবল চড়-চাপড়ই চলতে থাকে। বেশ সশব্দে। তপস্যা ওঁর মাথায় গিয়ে ওঠে।

কিন্তু মশার সঙ্গে মারামারিতে পারবেন কেন কাকা? প্রাণী হিসেবে ওরা খেচর, কাকা নিতান্তই স্থলচর। ওদের হ'ল আকাশপথে লড়াই আর কাকার ভূমিষ্ঠ হয়ে। তা ছাড়া, কাকার একাধারে দু'জনকে আক্রমন—মশাকে এবং কাকাকে। এক ধারে দুজনকে তিনি মারছেন! কাজেই, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেই, কাবু হয়ে পড়েন কাকা তাঁকে ক্ষান্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই ঘোরতর সংগ্রামে, মশাদের মধ্যে নিহতের তালিকা আমি দিতে পারব না—তবে আহতের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি—স্বয়ং আমার কাকা।

তাঁর বৈরাগ্য আসে তপস্যায়। এমন অবস্থায় কার বা না আসে? তিনি বলেন—"দে আমার কাপড়-জামা। আমার চাদরটাও দে। সিদ্ধিলাভ মাথায় থাক। কানে আমার কাজ নেই, ঘুমিয়ে বাঁচি।"

বিছানা বালিশ, পাশবালিশ, মশারি সবই ফিরিয়ে দিতে হয়। অবিলম্বেই লম্বা হন কাকা। মাটিতে শুয়ে পরনের কাপড়কেই লেপে পরিণত করি, কী আর করব? তারই তলায় গা ঢাকা দিয়ে আত্ম-রক্ষা করে ঘুমুতে হয়।

অমন ভয়ঙ্কর রাতও প্রভাত হয়। আবার সূর্যের মুখ দেখি

আমরা। ইতস্ততঃ তাকাতেই চোখে পড়ে—সেই ঘোড়া! একটু দূরে উবু হয়ে বসে আছে। অদ্ভুত দৃশ্য! ঘোড়াকে এ ভাবে বসে থাকতে জীবনে কখনও দেখি নি। সারারাত তপস্যা করছিল না তো?

কাকা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—"যাক, বাঁচিয়েছে। এতখানি পথ আর হেঁটে ফিরতে হবে না। বর না হোক, অশ্ববর তো পাওয়া গেল।"

কিন্তু পরমুহূর্তেই ওঁর উৎসাহ নিভে আসে। গত সন্ধ্যার দুর্ঘটনা স্মরণ ক'রে উনি দমে যান। আমি কাকাকে অভয় দিই—'সমস্ত রাত মশার কামড় খেয়ে সায়েস্তা হয়েছে ব্যাটা। দাঁড়াবারই ওর ক্ষমতা নেই, বসে পড়েছে, দেখছ না?'

"তাই বটে।" কাকা ঈষৎ চাঙ্গা হন, "তা হ'লে ঠুক্ ঠুক্ করে বেশ নিয়ে যেতে পারবে। কি বলিস?"

"নিশ্চয়! আর আমার তো সাইকেলই আছে।" আমি বলি।

কাছে গিয়ে ওকে উঠতে বলি—ওর গ্রাহ্যই নেই। কাকা তার কান মলে দেন। নট নড়ন-চড়ন! গালে আমি থাবড়া মারি, তথাপি, 'নিভ্রূক্ষেপ'! অগত্যা আমি আর কাকা দুজনে মিলে ল্যাজ ধ'রে ওকে তুলতে যাই। আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টায় অবশেষে ও খাড়া হয়!

"সারারাত চুপচাপ ছিল ঘোড়াটা। এত কাছেই ছিল অথচ! এর কারণ কিরে শিবে?" কাকা জিজ্ঞাসা করেন। "এ তো ভালো কথা নয়!"

"জপ করছিল বোধ হয়।" আমি ব্যক্ত করি, "সমাধি হয়ে গেছে দেখছ না!"

"তাই হবে। স্থান-মাহাত্ম্য যাবে কোথায়?" কাকার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, "এ তো সিদ্ধিলাভেরই জায়গা, তবে হাঁ—যদি না তুলে দেয়—"

সিদ্ধিলাভের কথায় কাকার কানের দিকে তাকাই। কানটা যথাস্থানেই নেই। কাকার সিদ্ধিলাভ আর হ'ল না এ যাত্রা। আমার হ্রস্বনিঃশ্বাস পড়ে।

কাকা ঘোড়ার পিঠে চাপেন। ঘোড়ার চলবার উদ্যোগই নেই,

সেই পুরনো বদ্-অভ্যাস। আমাদের ছিপটি মারার সাহস হয় না। কালকের অত ঘোরাঘুরির পরে—আবার? অনেক ক'রে ওকে বোঝাই। ও কেবল জবাব দেয়—"চিঁ-হি-হি!

এই ভাবে বহুক্ষণ আমাদের কথোপকথনের পর ও রাজী হয়; হাঁটতে সুরু করে। কিন্তু এ আবার কী বদ খেয়াল? পেছনে হাঁটতে থাকে! হ্যাঁ, সটান পেছনেই।

গতিক দেখে কাকা তো প্রায় কেঁদে ফেলেন। "কান তো গেছেই, এবার কি ঘোড়ার পাল্লায় পড়ে প্রানও যাবে নাকি শিবু?"

আমিও ভাবিত হই, কিন্তু ঘাবড়াতে দিই না কাকাকে। বলি—"ভয় খেয়ো না কাকা। বুঝতে পেরেছি, কী হয়েছে। আর কিছু না, ঘোড়াটা সিদ্ধিলাভ করেছে। একে স্থানমাহাত্ম্য, তার ওপর কাল সমস্ত রাত ধরে তপস্যা—যাবে কোথায়? তার ফলে এই কাণ্ড!"

"সিদ্ধিলাভ করেছে কি করে বুঝলি?" কাকার কণ্ঠ করুণতর হয়।

"এ আর বুঝছ না কাকা? যারা সিদ্ধিলাভ করে তারা কি আর আমাদের মত হবে? তা হ'লে সিদ্ধপুরুষে আর আমাদের মত কাঁচা পুরুষে তফাৎ কি? আমরা সাম্‌নে দিকে হাঁটি, সিদ্ধপুরুষ হাঁটবেন পেছনের দিকে। সিদ্ধিলাভ করলে পেছনে হাঁটতেই হবে। সিদ্ধপুরুষের চাল-চলনই আলাদা। সিদ্ধ ঘোড়ারও।"

আমার ব্যাখ্যা শুনে কাকার চোখ বড় হয়। তিনি তখন জাঁকিয়ে বসেন বাহনের পিঠে—"যাক্ বাঁচা গেছে, সিদ্ধিলাভের ফাঁড়াটা ঘোড়ার উপর দিয়েই গেছে। আমার হলে কি রক্ষা ছিল? এই দেহ নিয়ে এত বয়সে পেছনে হাঁটতে হলেই তো গেছলাম! অমন সিদ্ধি আমার পোষাত না—আমার চাইনে বাপু!"

আমি আন্দাজী রামপুরহাটের দিক্ নির্ণয় করে নিয়ে সেইমুখো ঘোড়াটাকে পেছন ফেরাই। কাকাও ঘুরে বসেন। বলেন—"দে, ল্যাজটা তুলে দে আমার হাতে। ওর ল্যাজকেই লাগাম করব! সিদ্ধপুরুষের আবার ল্যাজ কেন?"

ল্যাজ হস্তগত ক'রে কাকা অনুরোধ করেন—"এবার হাঁটো প্রভু!" অনেকটা গানের সুরেই।

আশ্চর্য, বলা মাত্রই ঘোড়াটা চলতে সুরু করে। বেশ ধীর চতুষ্পদক্ষেপে। রাগ-হিংসা-ক্ষোভ-দুঃখ-চালাকি-চতুরতা কোন কিছুর বালাই নেই ওর ব্যবহারে। শুধু সিদ্ধ নয়, এ সমস্তই সুসিদ্ধ হওয়ার লক্ষণ।

ঘোড়া চলতে থাকে। পেছন ফিরিয়ে সামনের দিকে, কিংবা মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে। যেটাই বলো।

আমিও সাইকেল চালিয়ে চলি। ওর পেছনে-পেছনে। কিংবা ওর মুখোমুখিই?

—শেষ—